ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল : ইতিহাস ও দর্শন

শৈল ঘোষ

ভূমিকা

ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের সঙ্গে যে গভীর এবং জটিল চিন্তাধারা জড়িয়ে আছে তা সমীক্ষণী তত্ত্ব বা ক্রিটিকাল থিয়োরি নামে পরিচিত। এই সমীক্ষণী তত্ত্ব বলতে ঠিক কি বোঝায় তা কিছুটা তর্কসাপেক্ষ। কারণ ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের চিন্তাধারা সবসময় যে এক এবং অনন্যধারায় প্রবাহিত হয়েছে তা নয়। এই স্কুলের তীক্ষ্ণধী লেখকদের লেখায় বিরোধ, এমনকি স্ববিরোধেরও উদাহরণ মেলে। সমীক্ষণী তত্ত্বের সামগ্রিক পরিচয় দেবার চেষ্টা করতে গেলে তাই অনেকটা ঝুঁকি নেওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

যে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির ওপর ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল গড়ে উঠেছে তার আসল নাম 'ইনস্টিটিউট অব্ সোশ্যাল রিসার্চ'। 'ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল' এই কথাটা চালু হয় গত শতাব্দীর ষাটের দশকে। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের বাইরের লোকজনই এটা চালু করেন। কিন্তু কথাটা একবার চালু হয়ে যাবার পর স্কুলের অন্যতম কর্ণধার অ্যাডোর্নো গর্বের সঙ্গে নিজেকে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের লোক বলে উল্লেখ করেছেন।

ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল এবং ক্রিটিকাল থিয়োরি বলতে যেমন একদিকে সমাজবিদ্যার বিশেষ এক আদি রূপক তথা প্যারাডাইম বোঝায় তেমনি অন্যদিকে এই স্কুলের সঙ্গে জড়িত একাধিক অত্যন্ত পরিচিত চিন্তাবিদ্‌দের নাম মনে আসে। যাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্যদের তালিকায় আছেন হর্কহাইমার, অ্যাডোর্নো, মার্কিউস এবং হাবারমাস এবং তাঁদের সঙ্গে ফ্রোম এবং বেঞ্জামিন। এই দুজনের মধ্যে ফ্রোম আমেরিকায় স্কুলের প্রবাস-জীবনের সময়েই তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন করেন, আর পরের জন অ্যাডোর্নোর সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব সত্ত্বেও কখনও ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু এইসব দার্শনিক এবং তাঁদের চিন্তাধারা ছাড়াও ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আর যে-বিষয়গুলি আমাদের স্মরণে আসে সেগুলি হল ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলন, ভাইমার রিপাবলিকের উত্থান এবং পতন, মার্কসবাদ এবং বুর্জোয়া সংস্কৃতির অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ, মনোবিশ্লেষণ, থার্ড রাইখ, ফ্যাসিজম, নাৎসীবাদ এবং ইহুদি নিধন। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের চিন্তাস্রোতের মধ্যে আমরা যেমন বিলম্বিত এবং একচেটিয়া পুঁজিবাদের আওতায় সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের গভীর বিশ্লেষণের ইঙ্গিত পাই, তেমনি তার ইতিবৃত্তের মধ্যে জার্মানির ইতিহাসকেও প্রতিবিম্বিত হতে দেখি। চিন্তাধারার দিক থেকে দেখতে গেলে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের ইতিহাসকে দুটি প্রধান অধ্যায়ে ভাগ করা যায়। একটি হল স্কুলের প্রতিষ্ঠা থেকে মোটামুটিভাবে অ্যাডোর্নোর মৃত্যু পর্যন্ত, আর একটি হল সত্তরের দশক থেকে হাবারমাসকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা স্কুলের সাম্প্রতিক অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়টিকে আবার কয়েকটি পর্বে ভাগ করা যেতে পারে, যেটা আমরা আমাদের আলোচনার মধ্যে পরিস্ফুট করার চেষ্টা করব।

ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল সম্পর্কে বিশদ আলোচনায় যাবার আগে কয়েকটি কথা বলে নেওয়া ভাল। সাধারণভাবে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের পরিচিতি হল এই যে এই স্কুলের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁরা একক এবং যৌথভাবে হেগেল এবং মার্ক্সের উত্তরাধিকারকে হাতিয়ার করে বাস্তব সামাজিক জীবনকে দ্বান্দ্বিক

বিরোধ এবং সমন্বয়ের যুগপৎ অধিষ্ঠানক্ষেত্র বলে মনে করেন। তাঁরা আরও মনে করেন এই দ্বান্দ্বিক বিরোধ এবং সমন্বয়-প্রচেষ্টার দার্শনিক-সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্যেই তার উত্তরণের বীজ নিহিত রয়েছে। কারণ বিশ্লেষণের মাধ্যমেই ভাবাদর্শগত কুহেলিকার পেছনের নগ্ন সত্যটি উদ্‌ঘাটিত হয়। যার ফলে মানব সমাজ এক উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত হবার জন্য তার প্রয়াসকে সংহত করতে পারে।

গত শতাব্দীর যাটের দশকে প্রধানত মার্কিউসের লেখার সূত্র ধরে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল ইউরোপ আমেরিকায় (এবং তার বাইরেও) বিশেষ পরিচিতি লাভ করে। তখন পশ্চিম ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যখন প্রতিষ্ঠানবিরোধী ছাত্রবিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছিল তখন এই বিক্ষোভের আদর্শগত প্রেরণার উৎস হিসেবে যাঁদের নামোচ্চারণ করা হত তাঁদের মধ্যে মার্ক্স, মাও-জে-দঙ, হো-চি-মিন এবং চে-গুয়েভারা যেমন ছিলেন তেমনি ছিলেন হার্বার্ট মার্কিউস। জার্মানীতে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলও এই আন্দোলনে বিশেষভাবে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তার মানে এটা বুঝলে ভুল হবে যে তখন ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের চিন্তাধারা একই ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। বরং ঐতিহাসিক সত্য এটাই যে তখন ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের দ্বিতীয় প্রজন্মের সঙ্গে প্রথম প্রজন্মের চিন্তাধারায় অনেকটাই বিভেদ ঘটে গেছে। বস্তুত এই স্কুলের বিবর্তনের প্রায় সব স্তরেই স্কুলের অত্যন্ত প্রতিভাবান চিন্তাবিদ্‌রা নিজেদের মতন করে তাঁদের সমকালীন দার্শনিক সামাজিক প্রশ্নাবলির মুখোমুখি হবার চেষ্টা করেছেন। এবং এই প্রচেষ্টায় দৃষ্টিভঙ্গির ঐক্য যেমন কিছুটা ছিল তেমনি গরমিলও কিছু কম ছিল না।

এখন এ-প্রশ্ন উঠতেই পারে যে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের নিজের ঘরেই যখন চিন্তার অনৈক্য তখন ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলকে আদৌ একটা 'স্কুল' বলা হয় কেন। তার কারণগুলি মোটামুটি এইরকম। প্রথমত, ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল নিজস্ব এক প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল, যার নাম ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল রিসার্চ। এই প্রতিষ্ঠানটি শত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের গবেষকদের একসূত্রে বেঁধে রাখবার চেষ্টা করে গেছে। দ্বিতীয়ত, এই স্কুলের প্রায় গোড়া থেকে পরবর্তী তিন দশকের ওপর সময় জুড়ে যুগপৎ তীক্ষ্ণধী এবং দক্ষ প্রশাসক যে মানুষটি এই প্রতিষ্ঠানটির যোগ্য পরিচালকের দায়িত্ব পালন করে গেছেন তাঁর নাম ম্যাক্স হর্কহাইমার। তিনি সব সময়েই তাঁর সহকর্মীদের একটা কথাই বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। সেটা হল সমকালীন সমাজকে সঠিকভাবে দেখার জন্য এক পূর্ণাবয়ব তত্ত্বের একান্ত প্রয়োজন। আর ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের সাধনাই হবে এই তত্ত্বের অন্বেষণ। তৃতীয়ত, হর্কহাইমারের এই দৃষ্টিভঙ্গি ইনস্টিটিউটের নিজস্ব ইস্তাহারেও প্রতিফলিত হয়েছিল। এই ইস্তাহারের মূল কথাগুলি উচ্চারিত হয়েছিল হর্কহাইমারের ১৯৩১ সালের এক বক্তৃতায়, যার শিরোনাম ছিল 'The Present State of Social Philosophy and the Tasks Facing an Institute of Social Research'। ইনস্টিটিউটের কাজকর্মে বারবার এই বক্তৃতাটি উল্লিখিত হয়েছে। তাছাড়া ১৯৫১ সালের যুদ্ধোত্তর যুগে প্রবাসী ইনস্টিটিউট আমেরিকা থেকে ফিরে এসে ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার যখন তার নতুন জীবন শুরু করল তখন ১৯৩১ সালের বক্তৃতাটিকেই ইনস্টিটিউটের কাজকর্মের দিশা নির্ণায়ক হিসাবে আবার গ্রহণ করা হল। চতুর্থত, এই স্কুলের চিন্তাধারার গ্রন্থন এবং প্রচারের জন্য ইনস্টিটিউটের নিজস্ব একটা প্রকাশনার কার্যক্রমও ছিল, যার মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ছিল এর পত্রিকা-

Journal of Social Research। তৎকালীন জার্মানীর প্রথম সারির প্রকাশকদের ঘর থেকেই ইনস্টিটিউটের পুস্তক এবং পত্র-পত্রিকা ছাপা হত। পঞ্চমত, এইসব ছাড়াও যে-জন্য ইনস্টিটিউট অব্ সোশ্যাল রিসার্চ ক্রমশ ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল বলে পরিচিত হতে থাকে সেটা হল স্কুলের একটা সামগ্রিক লক্ষ্য। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলে সামূহিক প্রচেষ্টার মূলে ছিল সমাজদর্শন এবং গবেষণার একটি নতুন আদর্শ নমুনার সৃষ্টি, যা একদিকে যেমন জার্মান দর্শন এবং সমাজবিজ্ঞানকে তার হাতিয়ার করবে, তেমনি একইসঙ্গে মনোবিশ্লেষণ এবং জার্মান দর্শনের ঐতিহ্যে গড়ে ওঠা যুক্তিবাদিতার সমীক্ষণকেও মার্ক্সের ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সঙ্গে অন্বিত করবে। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের প্রায় সবাই এমনকি ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের বাইরেও স্কুলের চিন্তাধারার অনুগামী অনেকেই 'ক্রিটিকাল থিয়োরি' কথাটা ব্যবহার করেছেন, যদিও ক্রিটিকাল থিয়োরি বলতে তাঁরা যে সবাই একই জিনিস বোঝাতে চেয়েছেন তা' নয়। এই প্রসঙ্গে একথাটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আমেরিকায় প্রবাস জীবন কাটাবার সময় ইনস্টিটিউট প্রাণপনে চেষ্টা করে গেছে ওখানকার সমাজবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞানীদের সঙ্গে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে। তাছাড়া ওদেশের তৎকালীন মার্ক্সবিরোধী আবহাওয়ায় তাঁরা নিজেদের মার্ক্সবাদী পরিচয় গোপন রেখে নিজেদের সমীক্ষণী তাত্ত্বিক হিসাবে পরিচয় দেওয়াটাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেছেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ইনস্টিটিউটের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে শুধুমাত্র হর্কহাইমার ও পোলক এবং কিছু পরে অ্যাডোর্নো জার্মানীতে ফিরে আসেন। তখন ইনস্টিটিউটের পত্রিকার প্রকাশনা অনেক দিন বন্ধ হয়ে গেছে। যদিও কিছু কিছু লেখা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হচ্ছে— তাদের মধ্যে বিষয় বা তত্ত্বগত যোগ বড় একটা ছিল না। হাবারমাস বলছেন, যখন তিনি অ্যাডোর্নোর সহকারী হিসেবে ১৯৫০ সালে ইনস্টিটিউটে যোগ দিলেন তখন সেখানে কোনও সুসংহত তত্ত্বের অস্তিত্ব তাঁর গোচরে আসে নি। বস্তুত ষাটের দশকেই ইনস্টিটিউটের চিন্তাধারা একটা স্পষ্ট আকার নিতে থাকে যা একদিকে অ্যাডোর্নো-হর্কহাইমারের দার্শনিক চিন্তা এবং অন্যদিকে ফ্রয়েড ও মার্ক্সের নবমূল্যায়ন। তবুও, হাবারমাসের বিশাল রচনাসম্ভারকে হিসেবের মধ্যে রেখেও একথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না যে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল যে সুসঙ্গত সমীক্ষণী তত্ত্বের অন্বেষণ করেছে তা এখনও পূর্ণায়ত হয়ে ওঠে নি।

অপিচ তাঁদের অসাধারণ প্রতিভা এবং অনন্যসাধারণ বিশ্লেষণী শক্তির ফসল ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের চিন্তাবিদরা তাঁদের রচনায় উপহার দিয়ে গেছেন যা সাম্প্রতিক কালের সমাজচিন্তায় অনেক ক্ষেত্রেই পথ-প্রদর্শকের কাজ করেছে। তার মধ্যে অন্যতম প্রধান বিষয়টি হল, যাকে ফুকো প্রায় অ্যাডোর্নোর ভাষায় বলেছেন, যুক্তিবাদিতার যুক্তিগ্রাহ্য সমীক্ষণ। ফুকো আরও বলেছেন, 'If I had known the Frankfurt School in time, I would have been saved a great deal of work. I would not have said a certain amount of nonsense and would not have taken so many false trails trying not to get lost, when Frankfurt school had already cleared the way'।

সামাজিক-দার্শনিক প্রেক্ষাপট

ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের চিন্তা-ভাবনা ধ্যান-ধারণা এমনকি তার উত্থান-অবরোহনের বিচিত্র ইতিহাসকে বুঝতে হলে তৎকালীন ইউরোপের, বিশেষ করে পূর্ব-ইউরোপের, জটিল সামাজিক-

অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অবস্থার কথা মনে রাখা দরকার। প্রথম মহাযুদ্ধের তখন সবে অবসান হয়েছে। তার প্রভাবে একদিকে যেমন জার সাম্রাজ্যের ভগ্নস্তুপের ওপর রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে তেমনি অন্যদিকে পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় সাম্যবাদী অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা বিফল হয়েছে এবং বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। একদিকে যেমন চলছে নতুনভাবে সমাজবাদকে বোঝার এবং সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারাকে পরিবর্তিত বাস্তবজীবনের কাছাকাছি এনে তাকে এক শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাবার চেষ্টা তেমনি অন্যদিকে জার্মানী ও ইতালীতে ক্রমশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে নাৎসীবাদ ও ফ্যাসিবাদ। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক পুঁজিবাদ ক্রমশ একচেটিয়া পুঁজিবাদের চেহারা নিচ্ছে। ক্রমশ এগিয়ে আসছে বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক মন্দার পদধ্বনি। তার সঙ্গে বিশেষ করে জার্মানীতে প্রচ্ছন্ন ইহুদি-বিদ্বেষ একটা প্রকাশ্য রাজনৈতিক বিষয় হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করেছে।

এখানে একথাটা বিশেষ করে স্মরণ করা প্রয়োজন যে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের প্রথম প্রজন্মের প্রায় সকলেই ছিলেন ইহুদি বংশোদ্ভুত জার্মান নাগরিক। এঁদের মধ্যে এরিখ্ ফ্রোম এবং লোয়েনথলের মতো যাঁরা নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে এসেছিলেন তাঁরা তো বটেই এমনকি স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ফেলিক্স ভাইল, হর্কহাইমার এবং অ্যাডোর্নোর মতো উপরতলার প্রতিষ্ঠিত পরিবারের মানুষেরাও কখনোই জার্মান সমাজে একীভূত হতে পারেন নি। সামাজিক জীবনে তাঁরা অনেকাংশেই প্রায় বহিরাগতই রয়ে গিয়েছিলেন। ১৯৪৬ সালে লেখা সার্ত্রের এক প্রবন্ধে জার্মান ইহুদিদের এই সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী অভিজ্ঞতা অদ্ভুত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। সার্ত্র বলছেন, 'He (the Jew) ..... accepts the society around him, he joins the game and he conforms to all the ceremonies, dancing with the others the dance of respectability. Besides, he is nobody's slave; he is a free citizen under a regime that allows free competition; he is forbidden no social dignity, no office of the state. He may be decorated with the ribbon of Legion of Honour, he become a great lawyer or a cabinet minister. But at the very moment he reaches the summits of legal society, another society - amorphous, diffused, and omnipresent – appears before him as if in brief flashes of lighting and refuses to take him in. How sharply he must feel the vanity of honours and of fortune, when the greatest success will never gain him entrance into that society which considers itself the 'real' one. As a cabinet minister, he will be a Jewish cabinet minister, at once an 'Excellency' and an untouchable.

আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখনও জার্মানীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সমাজতত্ত্বের আলাদা কোনও বিভাগ ছিল না। মোটামুটি প্রথম মহাযুদ্ধের পরে লিওপোল্ড ফন ভিজেই বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্বের বিভাগ খোলেন। যদিও ১৯০৮ সালেই ওয়েবার জার্মান সোশিওলজিক্যাল সোসাইটি স্থাপন করেছিলেন। সমাজতত্ত্বের পড়াশোনার ব্যাপক প্রসার ঘটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যার পিছনে আমেরিকার প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। সাধারণভাবে সমাজ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা হ'ত দর্শনের আলোকে এবং কিছুটা আইনশাস্ত্রের মাধ্যমে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্ক্সবাদ পঠন-পাঠন বা চর্চার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। সেটা শুরু হয় প্রথম মহাযুদ্ধের পরে। জার্মানী যেহেতু দর্শন এবং দার্শনিকদের দেশ তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারীভাবে না হলেও বেসরকারীভাবে

ছাত্রসমাজে মার্ক্সবাদের ভালরকম চর্চাই হত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে তো বটেই। আর তরুণ প্রজন্মের মধ্যে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল জীবনাচরণের দর্শন, অস্তিত্ববাদ আর অবভাসবাদ। আর ছাত্রসমাজের মধ্যে ভীষণ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন হাইডেগার। কারণ তাঁর লেখায় তৎকালীন সামাজিক অবক্ষয়ের কঠিন সমালোচনা পাওয়া যেত।

জার্মানী হ'ল কান্ট-হেগেলের দেশ এবং এই কান্টই আধুনিক যুগকে আলোকপ্রাপ্তির যুগ বলে অভিহিত করে যুক্তিবাদিতাই যে তার মূলে সে কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু আমরা যে-সময়ের কথা বলছি তখন আলোকপ্রাপ্তির হাত ধরে উঠে আসা উদারনৈতিক গণতন্ত্র এবং মানবমুক্তির জায়গায় ব্যাপ্ত হচ্ছে স্বৈরতন্ত্র এবং সামাজিক রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে বিস্তৃত হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের অবদমনের প্রচেষ্টা। ম্যাক্স ওয়েবার যাকে অনেকেই উদারনৈতিক মার্ক্স বলে চিহ্নিত করেছেন প্রথম মহাযুদ্ধের পর তাঁর লেখাতেও আমরা ক্রমশ যুক্তিবাদিতা এবং আমলাতান্ত্রিকতার নিগড়ে বাঁধা এক পিঞ্জরাবদ্ধ সমাজের ক্রমপ্রতিষ্ঠাজনিত হতাশার ছবি দেখতে পাই। তরুণ সমাজের মনে রাশিয়ার বিপ্লব নিয়ে প্রাথমিক উচ্ছ্বাসও আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে আসতে লাগল, বিশেষ করে লেনিনের মৃত্যু এবং স্টালিনের ক্ষমতায় আসার পর থেকে। সোভিয়েত রাশিয়া আদৌ মানবমুক্তির মার্ক্সবাদী ভবিষ্যত গড়ে তুলতে পারবে কিনা সংবেদনশীল যুবসমাজের মনে এ নিয়ে সংশয় দেখা দিল। সেই সঙ্গে তাঁরা মনে করলেন ধনতন্ত্রের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, পারিবারিক এমনকি ভাবাদর্শ এবং মনস্তাত্ত্বিক ক্ষেত্রেও যে পরিবর্তনগুলি এসেছে তার বস্তুনিষ্ঠ অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের প্রয়োজন। এর সঙ্গে বিশেষ করে বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের মনে আরও যে-সমস্যাটি ছিল তা হল বাস্তব জীবনে তত্ত্ব এবং প্রয়োগের অভিন্নতার সমস্যা। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের চিন্তানায়করা আরও অনেক প্রশ্নের সঙ্গে এইগুলিকেই তাঁদের দার্শনিক কর্মকাণ্ডের মূল হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এদিক থেকে দেখতে গেলে ইনস্টিটিউটের চিন্তাধারাকে যাকে পশ্চিমী মার্ক্সবাদ বলা হয় তার একটা ধারা হিসেবে ধরা যেতে পারে, যদিও ইনস্টিটিউটের ভাবনা-চিন্তার ব্যাপকতা আরও অনেক বেশি।

পরিশেষে আর একটা জিনিসের উল্লেখ করা দরকার। জার্মানীর পাশের রাষ্ট্র হ'ল অস্ট্রিয়া। দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে যোগাযোগও খুবই ঘনিষ্ঠ। তাই এক দেশের চিন্তাধারা অন্য দেশে সহজেই ছড়িয়ে পড়ে। অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা তখন জ্ঞানচর্চার একটি প্রধান কেন্দ্র। ভিয়েনা গোষ্ঠী তখন ইউরোপে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে। এই ভিয়েনা থেকেই তখন যে নতুন দার্শনিক চিন্তাধারা ক্রমশ পরিচিত হচ্ছে তার নাম যৌক্তিক দৃষ্টবাদ তথা লজিক্যাল পজিটিভিজম্। সামাজিক গবেষণাতেও তখন দৃষ্টবাদ ক্রমশ প্রভাব বিস্তার করছে। ফ্রাঙ্কফুর্টের চিন্তাবিদরা কোনোদিনই দৃষ্টবাদকে মেনে নিতে পারেননি। কারণ তাঁরা মনে করতেন যে সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার মূল প্রেরণা আসা উচিত সমাজ পরিবর্তনের প্রয়াস থেকে। নয়তো সমাজভাবনা অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাই ইন্‌স্টিটিউটের ইতিহাসের দুটি পর্বে আমরা অ্যাডোর্নো এবং হাবারমাসকে দৃষ্টবাদকেন্দ্রিক বিবাদে অংশ নিতে দেখি। কিন্তু ভিয়েনা ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের চিন্তাধারায় সুদূরপ্রসারী ছাপ রেখে গেছে ফ্রয়েডীয় এবং ফ্রয়েড পরবর্তী মনস্তত্ত্ব এবং মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে। পরে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভাষাতত্ত্ব। একই সঙ্গে মার্ক্স এবং ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের সংশোধনী ব্যাখ্যার মাধ্যমে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল যুগপৎ

ব্যক্তিক এবং সামাজিক অবদমনের ব্যাপারটা ধরতে চেয়েছেন এবং এই দ্বিবিধ অবদমন থেকে মুক্তিপথেরও সন্ধান করেছেন।

ইতিহাস

প্রতিষ্ঠা

আমরা আগেই বলেছি, যে প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল গড়ে উঠেছিল তার নাম 'ইনস্টিটিউট অব্ সোশ্যাল রিসার্চ'। আইনগতভাবে এই ইনস্টিটিউটটি ছিল সোসাইটি ফর সোশ্যাল রিসার্চের অধীন। এটি গড়ে তোলার পেছনে যাঁর অসামান্য অবদান ছিল তাঁর নাম ফেলিক্স ভাইল। ফেলিক্সের পিতা হারমান ভাইল আমস্টারডামের এক শস্যব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সামান্য কর্মচারী হিসাবে আর্জেন্টিনায় গিয়ে সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় ওখানকার সবচেয়ে বড় শস্যব্যবসায়ী হয়ে ওঠেন এবং সেই সুবাদে জার্মান সরকারের খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। ফেলিক্স কিন্তু অল্প বয়স থেকেই মার্ক্সবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং মার্ক্সবাদী প্রকাশনা ও বামপন্থী শিল্পী সাহিত্যিকদের উদারভাবে অর্থ সাহায্য করা ছাড়াও ১৯২০ সাল থেকেই অনেকগুলি র‍্যাডিকাল প্রকল্পের উৎসাহী সংগঠক হয়ে ওঠেন। ১৯২২ সালের গ্রীষ্মকালে তাঁরই উৎসাহ এবং অর্থানুকুল্যে সংগঠিত হয় 'প্রথম মার্ক্সবাদী কর্ম সপ্তাহ'। অনেকেই এটাকে ইনস্টিটিউটেরও প্রথম বেসরকারী সেমিনার বলে উল্লেখ করেছেন। এখানে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন লুকাচ, কর্শ, পোলক এবং ভিটফোগেল। এই কর্মশালার অনেকটাই সময় যায় পরে বহুখ্যাত, কিন্তু তখনও পর্যন্ত অপ্রকাশিত Marxism and Philosophy বইটির আলোচনায়। ভাইলের ইচ্ছে ছিল মার্ক্সবাদের প্রচার এবং প্রসারের জন্যে এই ধরনের আরও অনেকগুলি কর্মশালার আয়োজন করার। কিন্তু তাঁর কয়েকজন সহাধ্যায়ী বন্ধু তাঁকে বোঝালেন যে মার্ক্সবাদ চর্চা এবং মার্ক্সবাদী গবেষণার জন্য যা একান্ত প্রয়োজন তা হল একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। ফেলিক্স তখন তাঁর ভাবনা-চিন্তা, অর্থবল, উৎসাহ এবং কর্মশক্তি এই প্রয়াসে নিয়োগ করলেন। তাঁর পিতাও তাঁকে এই ব্যাপারে সর্বপ্রকার সাহায্য করলেন। এই মিলিত প্রচেষ্টার পরিণতি হিসাবে আমরা ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলকে পাই।

ইনস্টিটিউট অব্ সোশ্যাল রিসার্চ সরকারীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯২৩ সাল। ভাইমার জার্মানীর শিক্ষাদপ্তরের অনুমতি পেতে সাহায্য করেন তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী যিনি গণতান্ত্রিক সমাজবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর এবং ফ্রাঙ্কফুর্টের মেয়রের সাহায্যে ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনও পাওয়া গেল। ঠিক হল ইনস্টিটিউট তার কাজকর্ম সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে করতে পারবে। তবে ইনস্টিটিউটের গবেষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন পাঠনে প্রয়োজনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং অধ্যাপক হিসাবেও কাজ করতে পারবেন। হারম্যান ফেলিক্স 'সোসাইটি ফর সোশ্যাল রিসার্চ'-এর পুরো টাকা যোগানো ছাড়াও ইনস্টিটিউটের জন্য একটা বাড়ি এবং তার লাইব্রেরি এবং আর্কাইভস তৈরি করার জন্য আলাদাভাবে অর্থ মঞ্জুর করলেন।

ভাইলরা ভেবেছিলেন ইনস্টিটিউটটি তৈরি হলে তার পরিচালনাভার দেবেন গেরল্যাককে। কিন্তু তিনি ১৯২২ সালে মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সেই মধুমেহ রোগে মারা যান। তখনও পর্যন্ত ঐ রোগের কোনও চিকিৎসা ছিল না। ইনস্টিটিউটের প্রথম কর্ণধার হলেন কার্ল গ্রুনবার্গ। জাতিতে

অস্ট্রিয়ান এই মানুষটি ছিলেন সেই স্বল্প সংখ্যক জার্মানদের একজন যিনি তাঁর মার্ক্সবাদী পরিচিতি সত্ত্বেও কোনও জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকপদে বৃত ছিলেন। তিনি ইতিমধ্যেই জার্মান শ্রমিক শ্রেণির ইতিহাস রচনা করেছিলেন। জার্মানীতে তাঁকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের একজন অথরিটি বলে মনে করা হ'ত। সমাজতন্ত্র এবং মার্ক্সবাদ নিয়ে গবেষণার জন্য কোনও প্রতিষ্ঠান তৈরির কথা তিনি কিছুদিন ধরেই ভাবছিলেন, তাই ভাইলদের প্রস্তাবে তিনি সাগ্রহে সম্মতি দিলেন।

২২শে জুন ১৯২৪ রবিবার সকালে ইনস্টিটিউটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল। এই সভায় ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নবনিযুক্ত পরিচালক সমাজতন্ত্র এবং সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনে তাঁর গভীর বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করলেন। তিনি আরও বললেন, সাধারণভাবে জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্ক্সবাদের চর্চা হয় না। কিন্তু 'In the new Institute, Marxism from now on will have a home'। তিনি মনে করতেন বস্তুবাদী ইতিহাস চিন্তা কখনও ধ্রুব সত্য বা অভ্রান্ত নিয়মের অনুসন্ধানের চেষ্টা করে না। তাঁর কাছে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের অর্থ ছিল সমাজ পরিবর্তন এবং সমাজ উন্নয়নের তাত্ত্বিক বিচার। গ্রুনবার্গ বিশ্বাস করতেন তৎকালীন জার্মানীর সমাজজীবনে যে ভীষণ টানাপোড়েন চলছে আসলে তা এক আগামী পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী, যে পরিবর্তন এক উন্নততর জীবনের সূচনা করবে। আসলে এই বিবর্তন যে ফ্যাসিজম এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মতো এক বিরাট অবক্ষয়ী অধ্যায়ের দিকে জার্মানীকে ঠেলে দেবে তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি।

গ্রুনবার্গের মার্ক্সবাদী চিন্তাধারা অনেকটা সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক চিন্তাধারার কাছাকাছি ছিল। ইনস্টিটিউটের অনেকেই জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি বা সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সদস্য ছিলেন। অন্যরাও ছিলেন সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা এবং আন্দোলনের প্রতি আস্থাশীল। তাঁর সময়েই হেনরিক গ্রসম্যান এবং ফ্রেডরিক পোলক ইনস্টিটিউটে যোগ দেন। তাঁরা দুজনেই ছিলেন সুপরিচিত বামপন্থী অর্থনীতিবিদ। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যা পড়াতেন বা চর্চা করতেন তাও ছিল মার্ক্সবাদী অর্থনীতি।

গ্রুনবার্গ ইনস্টিটিউটের পরিচালক থাকাকালীন এখানকার গবেষণার ঝোঁক ছিল প্রথাগত মার্ক্সবাদের পথ অনুসরণ করে ঐতিহাসিক এবং অভিজ্ঞতাবাদী কাজকর্মের দিকে। গবেষণা প্রকল্পগুলির মধ্যে ছিল সমাজতন্ত্র, শ্রমিক আন্দোলন এবং অর্থনীতির ইতিহাস। সেই সময় মস্কোর মার্ক্স-লেনিন ইনস্টিটিউটের সঙ্গে ফ্রাঙ্কফুর্ট ইনস্টিটিউটের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়েছিল। কথা হয়েছিল দুটি ইনস্টিটিউটের যৌথ প্রচেষ্টায় মার্ক্স-এঙ্গেলসের সমস্ত রচনার তথ্য-টীকা সম্বলিত একটি সংস্করণ প্রকাশ করা হবে। কিন্তু সে-কাজ বেশি দূর এগোয়নি। তবুও ১৯২৮ সালের মধ্যেই ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরিতে প্রায় ২৮,০০০ বই সংগৃহীত হয়। ইনস্টিটিউটে ৩৪০টি জার্নাল এবং ৩৭টি সংবাদপত্রও পাওয়া যেত। ঐ বছর ইনস্টিটিউটের পাঠাগার ব্যবহার করেন প্রায় ৫০০০ পাঠক। ইনস্টিটিউটের প্রথম লাইব্রেরিয়ান হন রোজ উইটফোগেল।

গ্রুনবার্গ অবশ্য বেশিদিন ইনস্টিটিউটের কাজকর্মের নেতৃত্ব দিতে পারেননি। তাঁর কার্যকালের মেয়াদ শেষ হবার আগেই ১৯২৮ সালের জানুয়ারি মাসে গ্রুনবার্গ হৃদরোগে আক্রান্ত হন। ১৯২৯ সালে তাঁকে পরিচালকের পদ থেকে সরে দাঁড়াতে হয়, প্রথমে সাময়িকভাবে এবং

পরে চিরতরে। ১৯৩০ সালের অক্টোবর মাসে ম্যাক্স হর্কহাইমার, যিনি মাত্র দু'মাস আগে ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে সোশ্যাল ফিলসফির অধ্যাপকপদে যোগ দিয়েছিলেন, ইনস্টিটিউটের অস্থায়ী পরিচালকের পদে যোগ দিলেন। পরে ঐ পদে তাঁকে স্থায়ী করা হল। সেই সময় থেকে পরের তিন দশক, বস্তুত তাঁর অবসরগ্রহণ পর্যন্ত, তিনি ঐ পদের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। তাঁর সময়েই ইনস্টিটিউট-এর বিশেষ রূপটি আকার গ্রহণ করতে আরম্ভ করে।

উত্থান এবং দুর্যোগ

ফেলিক্সের মতো হর্কহাইমারও ছিলেন এক অত্যন্ত সম্পন্ন ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান যিনি পারিবারিক চাপকে অস্বীকার করে অধ্যয়ন-অধ্যাপনাকেই তাঁর বৃত্তি হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর বিষয় ছিল দর্শন, বিশেষ করে সমাজদর্শন। ১৯২৬ সাল থেকে ১৯৩১ সালের মধ্যে হর্কহাইমারের অনেকটা প্রবচনের ভঙ্গিতে লেখা বহু রচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৩৪ সালে এই লেখাগুলির এক সংস্করণ Dammerung নামে পুস্তকাকারে সংকলিত হয়। Dammerung বলতে বোঝায় আলো-আঁধারি যেটা প্রদোষ এবং গোধূলি দুটি ক্ষেত্রেই সমানভাবে লক্ষ করা যায়। এই রূপকের মাধ্যমে তিনি যেটা বলতে চেয়েছেন সেটা হল এই যে এই ধনতান্ত্রিক সমাজের গোধূলি এক নতুন প্রভাতের দ্যোতকও হতে পারে। এই গ্রন্থ যে জন্য বিশেষভাবে আলোচনার দাবি রাখতে পারে সেটা হল গ্রন্থটি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং বিশেষ করে বুর্জোয়া ভাবাদর্শের এক অসাধারণ সমীক্ষণ। অনেকে মনে করেন এই লেখাটিকে পরবর্তীকালের সমীক্ষণী তত্ত্বের প্রস্তাবনা হিসেবে ধরা যায়।

হর্কহাইমার সাধারণভাবে সোভিয়েত বিপ্লবের সমর্থন করলেও তিনি মনে করতেন না যে এই বিপ্লবের ফলে মানবমুক্তির যে স্বপ্ন তাঁরা দেখতেন সেটা পুরোপুরি সার্থক হবে। অন্যদিকে জার্মানীতে সমাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্রে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ক্রমাগত বিরোধ, জাতি বিরোধ এবং শ্রমিক শ্রেণির মধ্যেও তার দুর্ভাগ্যজনক অনুপ্রবেশ তাঁকে যুগপৎ বিষণ্ণ এবং বিরক্ত করত। বোধহয় সেইজন্যে তিনি কোনোদিন প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেননি। তাঁর এবং তাঁর অনুগামীদের ক্রমশ এ-বিষয়ে সন্দেহ হতে থাকে যে আগামী দিনে শ্রমিক শ্রেণি আদৌ কোন বিপ্লবের নায়ক হবে কিনা?

পরিচালকপদ গ্রহণ করার পর ২৪শে জানুয়ারি ১৯৩১ তারিখে তাঁর প্রথম ভাষণে যা বলেন তা সমীক্ষণী তত্ত্ব বোঝার পক্ষে অত্যন্ত জরুরী। এই বক্তৃতায় তিনি বলেন, সমকালীন প্রচলিত দর্শনগুলির কোনোটাই সমাজদর্শন হিসাবে সম্পূর্ণ নয়। একথা যেমন কান্ট হেগেল থেকে অবভাসবাদ তথা ফেনোমেনলজি এবং অস্তিত্ববাদ তথা এক্সিজস্টেনশিয়ালিজম সম্পর্কে প্রযোজ্য তেমনি প্রযোজ্য প্রত্যক্ষবাদী তথা এম্পিরিক্যাল সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধেও। সমাজদর্শনের লক্ষ্য হওয়া উচিত এমন একটি তত্ত্বের উদ্ভাবন যার মাধ্যমে মানুষের বস্তুগত এবং আধ্যাত্মিক কৃষ্টির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এর জন্যে যেটা প্রয়োজন সেটা হল দর্শন এবং সমাজবিদ্যার এক নতুন সমন্বয়।

হর্কহাইমারের অধীনে ইন্স্টিটিউটের দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে। গ্রুনবার্গের সময়েই প্রতিশ্রুতিবান বামপন্থী, বিশেষ করে মার্ক্সবাদী গবেষকদের ফেলোশিপ বা আর্থিক সহায়তাদানের মাধ্যমে ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যুক্ত করার যে নীতি গৃহীত হয়েছিল, হর্কহাইমারের সময় তা আরও

ফলপ্রসূ হয়েছিল। এই সময় অনেক প্রতিভাবান মানুষ ইনস্টিটিউটে তাঁদের কাজকর্ম শুরু করেন। ব্যক্তিগত জীবনে এঁরা প্রায় সবাই ছিলেন ইহুদি এবং উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান। ব্যতিক্রম ছিলেন এরিখ ফ্রোম এবং লিও লোয়েনথল। এঁরা যেমন বিভিন্ন অ্যাকাডেমিক ডিসিপ্লিন থেকে এসেছিলেন তেমনি এঁদের গবেষণার বিষয়বস্তুও এক ছিল না। বস্তুত তখনকার ইনস্টিটিউটের দুই প্রাণপুরুষ হর্কহাইমার এবং পোলক (যাঁদের সঙ্গে পরে যুক্ত হয়েছিলেন অ্যাডোর্নো) ঠিক এমনটাই চেয়েছিলেন। কারণ ইন্‌স্টিটিউটের কাজকর্মের মূল প্রেরণা ছিল এই যে মার্ক্সবাদের আলোকে বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের খণ্ডিত জ্ঞানের গণ্ডী অতিক্রম করে সার্বিক সমাজজীবনের এমন এক পূর্ণাবয়ব তত্ত্বের সন্ধান যা তখনকার সমাজের অন্তর্নিহিত বিরোধ এবং ত্রুটিগুলি উন্মোচন করবে এবং একই সঙ্গে এক উন্নততর সমাজজীবনে উত্তরণের পথের হদিশ দেবে। এই সময়ে যাঁরা ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথম সারিতে যাঁদের রাখা যায় তাঁরা হলেন ম্যাক্স হর্কহাইমার নিজে, হেনরিক গ্রসম্যান, ফ্রেডরিক পোলক, লিও লোয়েনথল, থিওডোর অ্যাডোর্নো, হার্বার্ট মার্কিউস, ফ্রানজ্ নয়ম্যান, অটো কার্শহাইমার, কুর্ট গেরল্যাখ এবং কার্ল ভিটফোগেল। এ-ছাড়া ওয়াল্টার বেঞ্জামিনও ইনস্টিটিউট থেকে তাঁর গবেষণা চালিয়ে যাবার জন্যে অর্থসাহায্য পেতেন, যদিও তাঁর সঙ্গে ইনস্টিটিউটের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না।

১৯৩৭ সালে হর্কহাইমার একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটির নাম "ট্র্যাডিশনাল অ্যান্ড ক্রিটিকাল থিয়োরি"। এই প্রবন্ধে লেখক সমাজবিদ্যার উদ্দেশ্য এবং গবেষণা-পদ্ধতি সম্পর্কে তঁ.র মতামত লিপিবদ্ধ করেন। বহুদিন পর্যন্ত এটাই ছিল ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের দিক্‌নির্দেশিকা। অনেক সময় ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের অনুগামীরা সমীক্ষণী তত্ত্ব-কে মার্ক্সীয় তত্ত্বের ছদ্মনাম হিসেবেও ব্যবহার করেছেন, যদিও পরে আমরা দেখব সমীক্ষণ-এর বিশেষ এক অর্থ আছে। এখানে একটা কথা পরিস্কার করে বলা দরকার যে, হর্কহাইমার ও তাঁর সতীর্থদের মার্ক্সবাদ প্রথাগত মার্ক্সবাদ থেকে অনেকটাই আলাদা। তাঁরা মনে করতেন প্রথাগত মার্ক্সবাদী ক্রিটিক গড়ে উঠেছে অর্থনৈতিক ভিত্তি এবং তার ওপর গড়ে ওঠা ভাবাদর্শের বাতাবরনে। সমাজবিশ্লেষণের এই পন্থা থেকে কিছুটা সরে গিয়ে তাঁরা মার্ক্সবাদের মূলবস্তুর সন্ধান খুঁজলেন 'specific criticism of alienated and alienating labour'-এর মধ্যে। আর এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁদের নিয়ে গেল মার্ক্সের প্রথম দিকের লেখার মধ্যে। বিশেষ করে এরিখ ফ্রোম এবং হার্বার্ট মার্কিউস তাঁদের 'authentic human existence'-এর অন্বেষায় তরুণ মার্ক্সের লেখার মধ্যে সঠিক পথের সন্ধান পেলেন। তাঁদের কাছে মার্ক্সের দৃষ্টিভঙ্গি বলে যেটা প্রতীয়মান হল সেটা এই যে, ধনতন্ত্র শুধু একটা অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক সঙ্কট নিয়ে আসে তাই নয়, ধনতন্ত্র বয়ে আনে মানবিক সত্তার এক গভীর সঙ্কট। পুঁজিবাদের বিশ্লেষণ তাই শুধু অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে ভুল হবে। তাকে মানবসত্ত্বার সত্যিকারের প্রকৃতির অনুধাবনায় নিয়োজিত হতে হবে। অ্যাডোর্নো তাঁর ১৯৩২ সালের লেখায় এই কথার প্রতিধ্বনি করে বলছেন ধনতান্ত্রিক সমাজে মানুষের প্রকৃত উত্তরণের পথ সব দিক দিয়ে বন্ধ। একটা অদৃশ্য বেড়াজাল সেখানে মানুষকে এমনভাবে ঘিরে রাখে যে তার পক্ষে কিছুতেই প্রকৃত অস্তিত্বের অভিজ্ঞতা অর্জন সম্ভব নয়। হর্কহাইমারও বলছেন বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থায় এমন কোনও যুক্তিনির্ভর ক্রিয়া সম্ভব নয় যা সত্যিই পরা-ব্যক্তিক এবং যা সমাজের কাছে দায়বদ্ধ। বুর্জোয়া সমাজে মানুষের শোষণ এবং লাঞ্ছনার প্রতি গভীর বিতৃষ্ণা

শুধু এঁদের নয় ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের সব লেখকের লেখাতেই ফুটে উঠতে দেখা যায়, বিশেষ করে বেঞ্জামিন এবং মার্কিউসের লেখায়। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল তাই এমন একটা তত্ত্ব তৈরি করার চেষ্টা করেছে যেটা শুধু সমাজ বিশ্লেষণের হাতিয়ারই হবে না, হবে সমাজের একটি সামগ্রিক তত্ত্ব এবং যেটা মানবমুক্তির এষণাকে একটা সঠিক পথ দেখাবে।

বিংশ শতকের তৃতীয় দশকের গোড়া থেকেই স্কুলের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ইতিমধ্যে ইনস্টিটিউটের নিজস্ব জার্নাল এবং ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যুক্ত লেখকদের প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে আরম্ভ করেছে। ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক এবং তাঁদের বিভিন্ন পাঠক্রম ছাত্রদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তবে এই জনপ্রিয়তা প্রধানত জার্মানীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল কারণ ইনস্টিটিউটের গবেষকরা জার্মান ভাষাতেই লিখতেন। পত্রিকাটিও বেরুতো জার্মান ভাষায়। এই দ্রুত জনপ্রিয়তা স্কুলের পক্ষে খুব যে একটা শুভ হয়েছিল এমন কিন্তু বলা যায় না। বরং ইনস্টিটিউটের কর্মীদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি বিরূপতা দানা বেঁধে উঠছিল। কোনও কোনও অধ্যাপক লিখিতভাবে সরকারের কাছে লেখেন যে বিশ্ববিদ্যালয় ক্রমশ মার্ক্সবাদের এবং বিপ্লবের ঘাঁটি হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। আর এই বিরূপতার সঙ্গে মিলে গিয়েছিল ইহুদি বিদ্বেষ। আগেই বলেছি ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের সঙ্গে যুক্ত মানুষজন ছিলেন একই সঙ্গে মার্ক্সবাদী এবং ইহুদি। সুতরাং স্কুলের ওপর একটা বিপর্যয় নেমে আসতে দেরি হয় নি।

বিপর্যয়

১৯৩৩ সালের ৩০শে জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট হিন্ডেনবার্গ হিটলারকে জার্মানীর চ্যান্সেলর নিযুক্ত করলেন। এতদিন তিনি এই সিদ্ধান্ত নিতে ভয় পাচ্ছিলেন কারণ তিনি জানতেন হিটলার ক্ষমতায় এলে জার্মানীতে নাৎসী একাধিপত্য স্থাপিত হবে। ঠিক যে দিন হিটলার ক্ষমতায় এলেন সেই দিনই হর্কহাইমার এবং অ্যাডোর্নো ক্রোনবার্গের যে বাড়িটায় থাকতেন সে বাড়িটা হিটলারের ঝটিকা বাহিনী (এস্. এ.) দখল করে নিজেদের ব্যারাকে পরিণত করল। সৌভাগ্যবশত, আগে থেকে খবর পেয়ে হর্কহাইমার আর তাঁর স্ত্রী কাছের এক হোটেলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এর পরেই তাঁরা জেনেভায় চলে যান এবং সেখান থেকেই সপ্তাহে একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাশ নিতে আসতেন। হর্কহাইমার এই সময়ে আরও যেটা করেন সেটা হল তিনি ডয়েশব্যাঙ্কের আমস্টারড্যাম শাখায় সোসাইটির সমস্ত টাকাকড়ি সরিয়ে ফেলেন। ইনস্টিটিউটের আরও অনেকেই এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়েন। শুধু অ্যাডোর্নো এবং তাঁদের পরিবারের অনেকেই আর অনেকদিন জার্মানীতে থেকে যান। যেহেতু অ্যাডোর্নো মুখ্যত সংস্কৃতি, বিশেষ করে সঙ্গীত এবং নন্দনতত্ত্বের ওপর লিখতেন, তাই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রথম দিকে অতটা তীব্র আকার ধারণ করেনি।

এইসব যখন ঘটছিল তখন ভিটফোগেল ছিলেন সুইজারল্যান্ডে। পোলক বারণ করা সত্ত্বেও ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি জার্মানীতে ফিরে আসেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কারারুদ্ধ হন। তাঁকে কন্‌সেনট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানো হয়। পরে নভেম্বর মাসে কোনোরকমে মুক্তি পেয়ে তিনি ইংল্যাণ্ড হয়ে আমেরিকা চলে যান। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের আর কেউ নাৎসীদের হাতে ধরা পড়েননি। ৫ই মার্চের নির্বাচনের পরে নাৎসীদল পুরোপুরি ক্ষমতা করায়ত্ত করে। ১৩ই মার্চ ইনস্টিটিউটে তল্লাসী হয় এবং ইনস্টিটিউট বন্ধ করে দেওয়া হয়। ইনস্টিটিউটের সমস্ত সম্পত্তি কমিউনিস্টদের সম্পত্তি বলে ঘোষণা করে

তা বাজেয়াপ্ত করা হয়। ঐ মার্চ মাসেই লোয়েনথলও ইনস্টিটিউট ছাড়তে বাধ্য হন। তিনিই ইনস্টিটিউটের শেষ দীপশিখাটি কোনোরকমে জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। ইনস্টিটিউটের নিজের বাড়ির একতলাটার দখল নিয়ে নাৎসী স্টুডেন্টস লীগ সেখানে তাদের অফিস খোলে। ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয় বা সেখানকার অধ্যাপকসমাজ এর বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদ তো করেইনি, বরং এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট একটা প্রস্তাব গ্রহণ ক'রে ইনস্টিটিউটের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়। বস্তুত আরও অনেক ব্যাপারেই জেনেভায় নির্বাসিত ইনস্টিটিউটের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরোধ বাড়তে থাকে। সোসাইটি ফর সোশ্যাল রিসার্চ গ্রুনবার্গের পেনশনের টাকা জোগাতে রাজি থাকলেও হর্কহাইমার এবং আরও একটি অধ্যাপকপদের খরচ বাবদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে সোসাইটির যে অর্থ পাওনা ছিল তা' বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দিতে অস্বীকার করে।

১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সোসাইটি ফর সোশ্যাল রিসার্চ-এর নাম পাল্টে Societe Internationale de Recherches Sociales রাখা হয়। জেনেভাকেই এই সোসাইটির মূল কেন্দ্র হিসেবে দেখানো হয়। অবশ্য সোসাইটির কর্তাব্যক্তিরা জানতেন যে জেনেভাতেও বেশিদিন সোসাইটির অফিস রাখা যাবেনা। কারণ নাৎসী জার্মানী এবং ফ্যাসিস্ট ইতালির নৈকট্য। কিন্তু সেটাই একমাত্র কারণ ছিলনা। সোসাইটির পরিচালকদের মধ্যে একমাত্র হর্কহাইমার ছাড়া আর কারোর অবাধ রেসিডেন্সি পারমিট ছিলনা। লোয়েনথল্ এবং পোলককে মাঝে মাঝেই কাছাকাছি বেলগ্রেডে গিয়ে তাঁদের ভিসা নবীকরণ করে আনতে হত। মার্কিউসকেও। তিনি অবশ্য সোসাইটির পরিচালকদের একজন ছিলেন না। তাছাড়া তাঁদের ব্যক্তিগত সমস্ত বই এবং কাগজপত্রও জেনেভার কাস্টমস অফিসে ট্রানজিট ডিপোজিটরিতে রাখা ছিল। ইনস্টিটিউট অবশ্য প্যারিস এবং লন্ডন থেকে অত্যন্ত উষ্ণ অভ্যর্থনাই পেয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধ এবং আর্থিক মন্দার সময়ে এই দুই জায়গার কোথাওই পুরোদমে নতুন ইনস্টিটিউট গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না।

এসব সত্ত্বেও প্যারিসের Centre de documentation at the Ecole Normale Superieure-তে ইনস্টিটিউটের একটা ছোট শাখা গড়ে ওঠে যেখানে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত পরিচালকের ভূমিকা পালন করেন লিওপোল্ড ফন ভিজের সহকারী এবং জার্মান মাতা ও ফরাসী পিতার সন্তান পল হোনিংগস্যাইম। অন্যদিকে লণ্ডনে লা-প্লে-হাউস-এ অবস্থিত ইন্‌স্টিটিউট অব সোশিওলজিতে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের একটা ছোট অফিস খোলার জায়গা দেওয়া হল। ল্যাস্কির ব্যক্তিগত উৎসাহ এবং প্রচেষ্টায় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরি এবং আর্কাইভস রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিল। এতসব ডামাডোলের মধ্যেও ইনস্টিটিউটের জার্নালের কারেন্ট ইস্যুটি জার্মানীতেই প্রকাশিত হল। তারপরের কয়েকটি সংখ্যা অবশ্য প্যারিস থেকেই বেরোয়। ইন্‌স্টিটিউটের প্রথম সারির লোকজনদের মধ্যে গ্রসম্যান চলে যান ফ্রান্সে এবং পরে ভিটফোগেলও তাঁর সঙ্গে যুক্ত হন। এদিকে এরিখ ফ্রোম রাজরোগে আক্রান্ত হলে তাঁকে অনেকদিন সুইজারল্যান্ডের ডাভোসে কাটাতে হয়। পরে ১৯৩৪ সালে তিনিও সস্ত্রীক আমেরিকায় চলে যান। ইনস্টিটিউটের জেনেভা শাখার দায়িত্ব নেন পোলক। পরে পোলকও আমেরিকায় চলে গেলে ইন্টারন্যাশনাল লেবার অফিসের সুপারিশে ডাচ সোশ্যালিস্ট স্টার্নহাইম ইনস্টিটিউটের জেনেভা অফিসের দায়িত্বে আসেন।

এত কিছুর মধ্যে ইনস্টিটিউটের কাজকর্ম এবং গবেষণা যে একই ধারায় চলবে এটা ভাবা অন্যায়। সঙ্গত কারণেই ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের কাজকর্ম এই সময় অনেকটা ভাঁটা পড়ে। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা ইন্‌স্টিটিউটের গবেষণার মূল ধারা তত্ত্বান্বেষণের পরিবর্তে প্রশ্নভিত্তিক এম্পিরিকাল গবেষণার দিকে মোড় নেয়। তাঁদের চিন্তাভাবনার বিষয়বস্তু ছিল স্বৈরাচারের চমকপ্রদ উত্থানের সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক কারণ। সমাজজীবনে এবং পারিবারিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সঙ্কটের প্রভাব এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের ওপর সামাজিক সঙ্কটের প্রতিক্রিয়া। এই প্রসঙ্গে এরিখ ফ্রোমের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলছেন "..... in the case of a serious crisis of the existing authoritarian society, the more a society collapses economically, socially and psychologically, and the more the unifying, formative force of a society as a whole or its ruling class decays, the greater are the differences in psychic structure in the various classes." এরই সূত্র ধরে পরিবারের মধ্যে একটি শিশু কীভাবে সামাজিক (socialized) হয়ে ওঠে সেই বিষয়টি নিয়ে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের কয়েকজন বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত হন। এই প্রসঙ্গে তাঁদের সাম্প্রতিক রাজনীতির ধারণাটিও উল্লেখ করা যেতে পারে। উদারনৈতিক রাষ্ট্র থেকে হঠাৎ স্বৈরাচারী রাষ্ট্রে রূপান্তরকে তাঁরা মনে করতেন এক অবিচ্ছিন্ন ধারার প্রকাশ যার মূলে আছে একচেটিয়া পুঁজিবাদ। 'The transition from the liberal to the total authoritarian state takes place on the basis of one and the same social order'। আরও স্পষ্ট করে একই কথা মার্কিউস বলেছেন এইভাবে, 'The total authoritarian state produces the organisation, and the theory of society which are appropriate to the monopoly stage of capitalism'। বস্তুত তাঁদের এই চিন্তাধারা তখনকার প্রধান মার্ক্সবাদী চিন্তারই প্রতিফলন। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল নিয়ে দীর্ঘদিন চর্চা করেছেন এমন একজন এই প্রসঙ্গে বলছেন, 'Marcuse, the critic of ideology, Fromm, the social psychologist, Mandelbaum and Meyer, the economists, and Horkheimer, the social philosopher, were thus all united in their agreement with the dominant communist interpretation of that period, according to which fascism was both the logical consequence of liberalism and the form of political domination which monopoly capitalism adopted.'

আশ্রয়ের সন্ধানে

হর্কহাইমার এবং তাঁর ঘনিষ্ঠরা ক্রমশ বুঝতে পারছিলেন যে সুইজারল্যান্ডে বেশিদিন ইন্‌স্টিটিউটকে রাখা যাবে না। হয়ত প্যারিস বা লণ্ডনেও নয়। তার কোথাও একটা নতুন আশ্রয়ের দরকার। কিন্তু এটাই ইনস্টিটিউটের একমাত্র সমস্যা ছিলনা। ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উৎখাত হবার ফলে এমনিতেই একটা প্রচণ্ড আর্থিক সঙ্কট এসেছিল। তার সঙ্গে ছিল বিশ্বব্যাপী মন্দার বাজারে সোসাইটির সঞ্চিত ধনের পড়ন্ত মান। হর্কহাইমারও শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সবদিক চিন্তা করে শেষ পর্যন্ত ঠিক হল আমেরিকায় ইনস্টিটিউটকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা। হর্কহাইমার প্রথম দিকে এর ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। কারণ তিনি মনে করতেন, আমেরিকায় সমাজবিজ্ঞানের গবেষণা পদ্ধতি ইউরোপ থেকে একেবারেই আলাদা, এবং সেখানে

দর্শনের কোনও স্থান নেই। তাই পোলকের সহকারী জুলিয়ান গুমপার্জকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হল ওখানকার অবস্থা বোঝার জন্য। ১৯৩৩ সালের শেষের দিকে কিছুটা সুস্থ হয়ে ফ্রোমও শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে দ্বিতীয়বার আমেরিকায় গেলেন। এঁরা দুজনেই আমেরিকা সম্পর্কে খুব উৎসাহজনক প্রতিবেদন পাঠালেন। ১৯৩৪ সালের মে মাসে তাঁর মনে অনেক দ্বিধা থাকা সত্ত্বেও হর্কহাইমার সস্ত্রীক ফ্রান্স থেকে রওনা হয়ে নিউইয়র্কে পৌঁছলেন। হর্কহাইমার তখনও বেশ অসুস্থ, এবং আবার নতুন করে নতুন জায়গায় ইনস্টিটিউট গড়ে তোলার ধকল নেবার পক্ষে তাঁর শরীর যথেষ্ট উপযুক্ত ছিলনা। তবুও সেই সময়কার এক চিঠিতে তিনি পোলককে লিখছেন, দেখেশুনে মনে হচ্ছে ইউরোপের চেয়ে আমেরিকার শান্ততর পরিবেশেই বোধহয় ইনস্টিটিউটের কাজকর্মের পক্ষে উপযোগী হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে ইনস্টিটিউটের আর্থিক সঙ্কটের কথা মাথায় রেখে তিনি এও বলছেন যে, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, আবার একটা ইনস্টিটিউট তৈরি করা উচিত হবে না ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের গবেষকরা সোসাইটির অধীনে আলাদা আলাদাভাবে কাজ করবেন। এর উত্তরে গুমপার্জ লিখেছেন প্রথমটা করা অসম্ভব হবে না আর বোধহয় ঠিকও হবে। যাই হোক শেষ পর্যন্ত তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রধান রবার্ট লিণ্ডের কাছে ইনস্টিটিউটকে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান দেবার প্রস্তাবটি উত্থাপন করলেন। লিণ্ড প্রস্তাবটি নিয়ে রবার্ট ম্যাকাইভারের সঙ্গে আলোচনা করেন। ম্যাকাইভার ছিলেন 'নিউ ডীল' কর্মপন্থার সমর্থক, কিছুটা বামপন্থী উদারনৈতিক মতবাদের মানুষ। তিনি কালবিলম্ব না করে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট নিকোলাস বাটলারকে লিখলেন, '...... a very good purpose could be served and the beginning of a closer relationship established, if this body of scholars were offered housing facilities by columbia'। বাটলার যিনি নিজেও রুজভেল্টপন্থী ছিলেন সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাবটিতে সম্মতি জানালেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বাড়ি ইনস্টিটিউটের জন্যে ছেড়ে দিতে রাজি হলেন। ব্যাপারটার এত দ্রুত নিষ্পত্তি হয়ে গেল যে বিস্মিত হর্কহাইমার গুমপার্জের কাছে জানতে চাইলেন যে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের কাজকর্ম সম্পর্কে সত্যিই অবহিত কিনা। এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার একটা কারণও ছিল, যেটা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। তখনও পর্যন্ত ইনস্টিটিউটের জার্নাল এবং অন্যান্য প্রকাশনা ছিল শুধুই জার্মান ভাষায় লেখা। অল্প কয়েকটি লেখারই শুধু ইংরেজি সারাংশ পাওয়া যেত।

ইতিমধ্যে ১৯৩৪ সালে চিকিৎসার জন্য সান্টা ক্রে-তে যাবার পথে ফ্রোম নিউ ইয়র্কে আসেন। তখন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে একটা অতিথি অধ্যাপক পদ দিতে চাইলে তিনি সেটা গ্রহণ করেন। চিকিৎসান্তে ফিরে এসে তিনি তাঁর মনোবিশ্লেষণের চিকিৎসাকেন্দ্রটিকেও নিউ ইয়র্কে সরিয়ে নিয়ে আসেন। জুলাই মাসে মার্কিউস এবং আগষ্ট মাসে লোয়েনথল ও পোলক আমেরিকায় পৌঁছোন। সেপ্টেম্বর মাসে ভিটফোগেলও আমেরিকায় পৌঁছোনোর সঙ্গে সঙ্গে ইনস্টিটিউটের 'কোর গ্রুপ' আবার নিউ ইয়র্কে মিলিত হলেন। ব্যতিক্রম ছিলেন গ্রসম্যান আর অ্যাডোর্নো। গ্রসম্যান জেনেভায় থেকে ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর সোশ্যাল রিসার্চের মূল কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। জেনেভার অফিসটি হল ইনস্টিটিউটের পরিচালনার কেন্দ্র আর নিউইয়র্কের শাখাটি হল লেখাপড়ার জায়গা। প্রাথমিকভাবে নিউইয়র্কের

শাখাটির নাম নেওয়া হয়েছিল ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব্ সোশ্যাল রিসার্চ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে ইন্টারন্যাশনাল শব্দটি বাদ দেওয়া হল। তারপর থেকে প্রতিষ্ঠানটি ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল রিসার্চ নামেই পরিচিত হতে থাকে। (এরপর থেকে আমরা এই ইনস্টিটিউটকে সংক্ষেপে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল বা শুধুই স্কুল বলে উল্লেখ করব।)

নতুন জগতে

এটা মনে রাখতে হবে যে তিরিশের দশকের গোড়ায় যখন হর্কহাইমার-গোষ্ঠীর বুদ্ধিজীবীরা আমেরিকায় আসেন তখন রুজভেল্ট প্রশাসনের কিছুটা বামঘেঁষা এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় শাসনের ফল কিছুটা ফলতে আরম্ভ করেছে। তাছাড়া তখনও পর্যন্ত ইউরোপ থেকে আমেরিকায় কাতার দিয়ে পালিয়ে আসা— বিশেষ করে অধ্যাপক, লেখক, শিল্পী, বিজ্ঞানী, রাজনৈতিক কর্মী এবং বুদ্ধিজীবীদের — শুরু হয়নি। ইনস্টিটিউটের আর্থিক অবস্থা হর্কহাইমারের অত্যন্ত দক্ষ পরিচালনা সত্ত্বেও খুব একটা ভাল ছিল না। জার্মানীতে থাকা অবস্থায়ও স্কুল থেকে মাস মাইনে দেওয়া হত মাত্র অল্প কয়েকজনকে। কয়েকজন ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যাপক হিসাবে মাইনে পেতেন। কয়েকজনের নিজের পেশা থেকে সংসার প্রতিপালনের খরচ সংগ্রহ করতেন। ফ্রোম যেমন ফ্রাঙ্কফুর্টে তাঁর মনোরোগের চিকিৎসা-কেন্দ্রটি চালাতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে। যে-সমস্ত সহকারীরা ছিলেন তাঁদের জন্য মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। আর কেউ কেউ তাঁদের বিশেষ গবেষণা প্রকল্পের জন্য পেতেন অনুদান। যেমন বেঞ্জামিন তাঁর Passagen werke-এর জন্যে। আমেরিকায় আসার পর হর্কহাইমার হল্যাণ্ড থেকে স্কুলের সমস্ত অর্থ সরিয়ে আনলেন। তাতে যদিও কিছুটা আর্থিক স্বস্তি এবং নিশ্চয়তা পাওয়া গেল, কিন্তু আর্থিক উন্নতির কোনও আশু সম্ভাবনা দেখা গেলনা। তাছাড়া জেনেভা, প্যারিস, লণ্ডন, নিউইয়র্কে —ফ্রাঙ্কফুর্টের কথা ছেড়েই দিলাম—ইনস্টিটিউটের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সম্পত্তির হিসেব নিকেশ এবং কাজকর্মের দেখাশোনা করা সহজ ছিলনা। তার জন্য সামান্য হলেও কিছু খরচ ছিল। সুতরাং এটা পরিস্কার বোঝা যাচ্ছিল যে ইনস্টিটিউট মাত্র অল্প কয়েকজনকেই মাসিক বেতন দিতে পারবে, এবং সেখানে অগ্রাধিকার পাবেন সোসাইটির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত দু-তিন জন। বাকি সকলকেই হয় নিজেদের খরচ নিজেদেরই চালাবার ব্যবস্থা করতে হবে, নয়তো স্কুলের খুবই সামান্য বৃত্তির ওপর নির্ভর করতে হবে। তৃতীয় আরও দুটো পথ খোলা ছিল। প্রথমটা হল স্কুলের নিজের গবেষণা প্রকল্পের জন্য বিভিন্ন ফাউন্ডেশনের কাছ থেকে সাহায্য সংগ্রহ করা, নয়তো স্কুল চালাবার এবং স্কুলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গবেষকদের একসঙ্গে ধরে রাখার জন্য স্কুলের বাইরে থেকে অর্থের বিনিময়ে গবেষণা প্রকল্প সংগ্রহ করা। প্রথম দিকে এমনকি রকফেলার ফাউণ্ডেশনের কাছে আবেদন করেও ইনস্টিটিউট তার নিজের গবেষণা প্রকল্পের জন্যে কোনও অনুদান সংগ্রহ করতে সফল হয়নি।

১৯৩৫ এবং ১৯৩৭ সালে হর্কহাইমার দু'বার প্যারিস যান। তখন অ্যাডোর্নোর সঙ্গে তাঁর অনেকবার পত্রালাপ হয়। তখনও অ্যাডোর্নো ইউরোপে থেকে যাবার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর। ১৯৩৫ সালে হর্কহাইমার অ্যাডোর্নোকে লেখেন যে অ্যাডোর্নো যদি আমেরিকায় চলে আসেন তাহলে তাঁরা দুজনে তাঁদের যুগ্ম তাত্ত্বিক গবেষণার কাজটি আবার শুরু করতে পারেন। তিনি আরও লেখেন যে, তিনি সব সময়েই প্রগতিশীল এবং বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের সঙ্গে যুক্ত

করতে চান বটে কিন্তু সেটা স্কুলের নিজস্ব চিন্তাধারা বিসর্জন দিয়ে নয়। এবং সেইজন্য অ্যাডোর্নোর মতো মানুষের ইনস্টিটিউটের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকার প্রয়োজন রয়েছে। ১৯৩৭ সালে অ্যাডোর্নোকে লেখা আর একটা চিঠিতে হর্কহাইমার বলছেন যে ঐ বছর ইউরোপে থাকার সময় তাঁর সবচেয়ে আনন্দময় যে দু'ঘন্টা কেটেছে তা হোল বেঞ্জামিনের সান্নিধ্যে। তার পরেই বেঞ্জামিনকে স্কুলের নিয়মিত সদস্য করে নেওয়া হয় যদিও ১৯৩৫ সালেই Passagen werke-কে ইনস্টিটিউট তার গবেষণা প্রকল্পের তালিকায় স্থান দিয়েছিল। হর্কহাইমার এবং ইনস্টিটিউটের পরিচালকরা যেজন্য বেঞ্জামিনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন সেটা শুধুমাত্র প্যারিসের আর্কেড, বোদলেয়রের কবিতার সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বা মধ্যযুগের কথকের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ভূমিকাই নয়। বেঞ্জামিন মনে করতেন সমকালীন সঙ্কটের মূলে রয়েছে কৃৎকৌশলের ওপর ভ্রান্ত নির্ভরতার বিধ্বংসী প্রতিক্রিয়া। উনবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর তিরিশ দশক কেটে যাবার পরেও মানুষ এ-ব্যাপারে সচেতন হয়নি যে কৃৎকৌশলের পণ্য উৎপাদন ছাড়া সমাজকে আর কিছু দেবার নেই। বেঞ্জামিন আরও মনে করতেন যে অভিজ্ঞতাবাদ কৃৎকৌশলের উন্নতির মধ্যে বিজ্ঞানের প্রগতিই দেখে, সমাজের অধোগতি দেখে না। 'It escaped the positivist that the development of technology, made it more difficult for the proletariat to take possession of it'। এর সবগুলিই ছিল ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলেরও মূল বক্তব্যগুলির অন্যতম। বেঞ্জামিন অবশ্য বেশিদিন বাঁচেননি। ১৯৪০ সালে জার্মানী ফ্রান্স অধিকার করার পরে স্পেনে পালিয়ে যাবার সময় ফ্রান্স এবং স্পেনের সীমান্তে এক দুর্ভাগ্যজনক অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

১৯৩৫ থেকে ১৯৩৮ সালে ইনস্টিটিউট বেশ কয়েকটি অভিজ্ঞতানির্ভর প্রকল্প হাতে নিয়েছিল, যেমন ছাত্রীদের ওপর কর্তৃত্বের প্রভাব এবং পারিবারিক কর্তৃত্বের ওপর বেকারত্বের প্রতিক্রিয়া। দ্বিতীয় প্রকল্পটি ভিয়েনা, প্যারিস এবং নেওয়ার্কে করা হবে প্রথমটা এমনই ঠিক ছিল। পরে অবশ্য যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ায় সেটা আর সম্ভব হয়নি। ফ্রাঙ্কফুর্ট থাকাকালীনই ইনস্টিটিউট পরিবারের মধ্যে সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়াটি কিভাবে চলে সেই বিষয়ে একটি কাজ আরম্ভ করেছিল। এটির নাম ছিল studies in Authority and Family। আর একটি কাজ ছিল শ্রমিক শ্রেণিকে নিয়ে। এই দুটি প্রকল্পের জন্যই দীর্ঘ প্রশ্নতালিকার ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল, কিন্তু সেগুলি বিশ্লেষণ করা যায়নি। এখন এই দুটি প্রকল্পও শেষ করার কাজে হাত দেওয়া হল।

ইতিমধ্যে পল ল্যাজার্সফেল্ড স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। তাঁকে নেওয়ার্কের কাজের পুরো দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাঁর মা ছিলেন এ্যাডলারের ছাত্রী এবং ভিয়েনায় নারীবাদী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। অল্পবয়সেই তিনি অস্ট্রিয়ান মার্ক্সবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯২৭ সালে Economic and Psychological Institute নামক একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করে একদিকে যেমন রাশিবিজ্ঞানভিত্তিক বাজার-কেন্দ্রিক গবেষণায় হাত দেন তেমনি অন্যদিকে সামাজিক গবেষণার কাজও শুরু করেন। তাঁর প্রথম প্রকল্পটি ছিল ছাত্র-যুবকরা কিসের ভিত্তিতে তাঁদের পেশা বেছে নেন। সেই সূত্রে রকফেলার ফাউণ্ডেশনের একটি বৃত্তি নিয়ে তিনি আমেরিকায় আসেন। ১৯৩৪ সালে অস্ট্রিয়ার সংবিধান বাতিল করে ফ্যাসিস্টরা ক্ষমতায় এলে তাঁর আর দেশে ফিরে যাওয়া সম্ভব ছিলনা। Authority and Family নামক গবেষণা প্রকল্পটির সূত্রে তিনি

হর্কহাইমারের সংস্পর্শে আসেন। তাই নেওয়ার্কের কাজটি হাতে নেবার অনুরোধ এলে তিনি সাগ্রহে সে প্রস্তাব গ্রহণ করেন যদিও তার জন্যে দক্ষিণা ছিল সামান্য। নেওয়ার্কে নতুন গড়ে ওঠা বিশ্ববিদ্যালয়েও সৌভাগ্যবশত তাঁর কাজ জুটে যায়, যদিও সেখানেও বেতন ছিল সামান্য।

১৯৩৭ সালে রকফেলার ফাউণ্ডেশন বেতারের শ্রোতাদের ওপর এক বিশাল গবেষণা প্রকল্পের জন্য অর্থ সাহায্য দিতে রাজি হয়। এটাও প্রস্তাব করা হয় যে এই প্রকল্পটি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইনস্টিটিউট যুগ্মভাবে হাতে নেবে। প্রথমে হর্কহাইমার এ-ব্যাপারে খুব উৎসাহিত ছিলেন না। কিন্তু পরে ১৯৩৮ সালে তার মনে হল এই প্রকল্পের সঙ্গীত সম্পর্কিত অংশটির সঙ্গে যদি অ্যাডোর্নোকে যুক্ত করা যায় তাহলে হয়ত অ্যাডোর্নো আমেরিকায় আসতে রাজি হতে পারেন। তাঁর এবং তাঁর পরিবারের পক্ষেও আর ইউরোপে থাকা সম্ভব হচ্ছিল না। অ্যাডোর্নোও এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ল্যাজার্সফেল্ডকেও এই গবেষণা প্রকল্পটির সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

১৯৪০ সালে ল্যাজার্সফেল্ড কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে এলে তিনিই হয়ে ওঠেন আমেরিকার বিদ্বজ্জনের সঙ্গে ইনস্টিটিউটের যোগাযোগের মূল সূত্র। এখানে এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন শ্রমিক শ্রেণি এবং পরিবার ও প্রভুত্বের ওপর দুটি গবেষণার সঙ্গে এরিখ ফ্রোম গোড়া থেকেই যুক্ত ছিলেন এবং আমেরিকাতেও রইলেন। এই সময়ে আর একটি প্রকল্পের কিছু আর্থিক দায়িত্ব স্কুল নিজের কাঁধে নিয়েছিল। এটি হোল ভিটফোগেলের চীন সংক্রান্ত গবেষণা। ভিটফোগেল যখন চীনে যান তখন তাঁকে বিশেষ করে বলা হয়েছিল চীনের পুরোনো পারিবারিক ব্যবস্থা এবং তার সঙ্গে আধুনিক শ্রমিক এবং শ্রমজীবনের ওপর তথ্য সংগ্রহ করতে। তার জন্যে একটি প্রশ্ন-তালিকাও তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। ভাবা হয়েছিল এই প্রশ্ন-তালিকার উত্তরগুলি পাওয়া গেলে ইউরোপ-আমেরিকার শ্রমিক সমাজের সঙ্গে চীনের শ্রমিক সমাজের একটা তুলনামূলক কাজ করা যাবে। ভিটফোগেল ১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত চীনে ছিলেন। কলম্বিয়ায় ফিরে ১৯৩৭ সালে স্কুল কর্তৃক আয়োজিত এক সভায় তিনি চীন সম্পর্কে তাঁর গবেষণার একটি প্রাথমিক প্রতিবেদন পেশ করেন। এটাও ঠিক হয় যে অর্থের সংস্থান করা সম্ভব হলে ভিটফোগেলের চীন সংক্রান্ত চারটি গ্রন্থের প্রকাশনার ভার ইনস্টিটিউটই নেবে।

এবার হর্কহাইমারের কাজের প্রসঙ্গে আসা যাক। লুকাচ তাঁর এক প্রবন্ধে ১৮৬৮ সালে জোসেফ ডিট্‌জেনকে লেখা মার্ক্সের একটি চিঠির উল্লেখ করেছেন। এই চিঠিতে মার্কস বলছেন, 'When I have taken off my burden of economics, I will write a 'Dialectics'. The True laws of dialectics are already to be found in Hegel, albeit in a mystical form. What is needed is to strip them of that form.' ১৯৩৯ সালের এক চিঠিতে হর্কহাইমার এই ধরনের কাজ হাতে নেবার ইচ্ছার কথা জানিয়ে লিখছেন, "All of my plans at the moment are directed towards working, over the next few years, on the book for which all my earlier studies, published or unpublished, have been grounded'। ফ্রোমকেও তিনি লিখেছেন যে তিনি আবার তাঁর dialectical logic এর ওপর কাজটা শুরু করতে চান। এই কাজে তিনি যাঁদের সাহচর্য আশা করছিলেন তাঁরা হলেন, মার্কিউস, কর্শ এবং অবশ্যই অ্যাডোর্নো।

হর্কহাইমার ইনস্টিটিউটের দায়িত্ব নেবার পর তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে বলেছিলেন যে, সমাজকে ঠিক মতো জানতে এবং বুঝতে হলে শুধু যে সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের, যেমন দর্শন, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, ইতিহাস এবং মনোবিজ্ঞান, গবেষকদের একসঙ্গে কাজ করা দরকার তাই নয়, তাদের সঙ্গে প্রকৃত বিজ্ঞানীদেরও হাত মেলানো উচিত। এর ফলে দর্শন এবং বিজ্ঞানের মধ্যে একটা দ্বান্দ্বিক সমাহার সম্ভব হবে, যা সমাজকে সঠিকভাবে জানার এবং তাকে একটা উন্নত স্তরে নিয়ে যাবার পথের সন্ধান দেবে। কিন্তু বাস্তবে যেটা ঘটল সেটা হল এই যে স্কুলের গবেষণায় দর্শন এবং সমাজবিজ্ঞানের গবেষণা দুটি ভিন্ন এবং প্রায় সমান্তরাল ধারায় চলতে শুরু করল, বিশেষ করে হর্কহাইমার লস এঞ্জেলসে চলে যাবার পরে।

আমেরিকায় আসার অনেক আগে থেকেই হর্কহাইমারের স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছিলনা। নিউইয়র্কে থাকার সময় তাঁর স্বাস্থ্যের আরও অবনতি ঘটে। সোসাইটির পরিচালকরা ভীত হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত ঠিক হয় হর্কহাইমার লস এঞ্জেলসে থাকবেন এবং সেখান থেকেই ইনস্টিটিউটের কাজকর্ম এবং নিজের গবেষণা চালিয়ে যাবেন। অ্যাডোর্নোকেও তিনি ওখানে তাঁর সঙ্গী এবং সহ-গবেষক হিসেবে চেয়েছিলেন। টমাস মান তখন ওখানে প্রায় নির্বাসিতের জীবন যাপন করছিলেন। পরে এলেন ব্রেখ্‌ট্ এবং আরও অনেকে। লস্ এঞ্জেলস আস্তে আস্তে প্রবাসী জার্মান সংস্কৃতির একটা কেন্দ্র হয়ে উঠতে লাগল।

অ্যাডোর্নো নিউইয়র্কে আসেন ১৯৩৮ সালে। তার আগেই ল্যাজার্সফিল্ডকে কেন্দ্র করে বেতার শ্রোতাদের নিয়ে সমীক্ষার কাজ শুরু হয়ে গেছে। অটো কার্শহাইমার এবং ফ্রান্‌জ্ নয়ম্যানও আমেরিকায় পৌঁছে গেছেন। জার্মানী থেকে নির্বাসিত হবার পর এঁরা দুজনেই ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন ইউরোপীয় শাখাগুলিতে কাজ করে যাচ্ছিলেন। এঁদের মধ্যে নয়ম্যান প্রায় হর্কহাইমারের সঙ্গে সঙ্গেই জার্মানী ছেড়েছিলেন। তারপর তিনি ইংল্যাণ্ডে আসেন। সেখানে ল্যাস্কির পরামর্শে এবং সুপারিশ নিয়ে তিনি লন্ডন স্কুল অব্ ইকনমিক্স-এ ভর্ত্তি হন এবং সেখান থেকে একটা ডিগ্রি সংগ্রহ করেন। তখন ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরি ওখানে স্থানান্তরিত হয়েছিল। ল্যাস্কি এবং কার্ল ম্যানহাইমের সুপারিশে তিনি ওই লাইব্রেরির ভারপ্রাপ্ত হন। নাৎসী জার্মানীর হাত থেকে লাইব্রেরিকে বাঁচাবার জন্যে ততদিনে লাইব্রেরির স্বত্বাধিকার এল.এস.ই-কে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

অন্যদিকে কার্শহাইমার ১৯৩৩ সাল থেকেই প্যারিসে ইনস্টিটিউটের কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছিলেন। নয়ম্যানের মতো তিনিও আইনশাস্ত্রের ছাত্র ছিলেন। ১৯৩৮ সালে তিনি The Labour Market and the Penal System নামক গ্রন্থটির কাজ শেষ করেন। ১৯৩৯ সালে Punishment and Social Structure বইটি প্রকাশিত হয়। কার্শহাইমার ছিলেন এই গ্রন্থটির যুগ্ম লেখক। কার্শহাইমার, নয়ম্যান কিংবা অ্যাডোর্নো কেউই ইনস্টিটিউট থেকে নিয়মিত কোনও অর্থ সাহায্য পেতেন না। তাই তাঁরা মূলত পত্র-পত্রিকায় সাহিত্য শিল্প এবং সঙ্গীতের ওপর প্রবন্ধ লিখে কিছু কিছু অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করতেন। তবে প্রয়োজনে ইনস্টিটিউটের কাজ করতে তাঁরা কখনও আপত্তি করেন নি। বস্তুত নয়ম্যানকে ১৯৩৬ সালে ইনস্টিটিউটের আর্থিক এবং প্রশাসনিক কয়েকটি ব্যাপার দেখাশোনা করার জন্য ছ'মাসের জন্যে বুয়েনেস এয়ার্সে পাঠানো হয়েছিল। সেখানে ফেলিক্স ভাইলেরও একটি মামলার তিনি দেখাশোনা করেন। ১৯৩৭ সালে কলম্বিয়া

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কয়েকটি বক্তৃতা দেবার জন্যে তিনি আমন্ত্রণ পান। ততদিনে তাঁর Behemoth বইটি প্রকাশিত এবং প্রচুর সমাদৃত হয়েছে। এরপর আর তাঁকে পিছন দিকে তাকাতে হয় নি।

১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৪২ সাল—এই সময়টাতে ইনস্টিটিউটের পুরোনো গৌরবের দিনগুলি আবার নতুন করে ফিরে আসার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। ঐ সময়ের মধ্যে ইনস্টিটিউটের পতাকাতলে যাঁরা সমবেত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন হর্কহাইমার এবং পোলক ছাড়াও ফ্রোম, গ্রসম্যান, গুমপার্জ, লোয়েনথল, মার্কিউস, অ্যাডোর্নো এবং ভিটফোগেল। তাছাড়াও ছিলেন নয়ম্যান, কার্শহাইমার এবং বেঞ্জামিন। এঁরা ছাড়াও অনেক প্রতিভাশালী তরুণ স্কুলের কাজকর্মে যুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেটা সম্ভব হয় নি, বরং ইনস্টিটিউটের জীবনে একটা নতুন ধরনের সঙ্কট দেখা দিল।

নতুন সঙ্কট

তিরিশের দশকের শেষের দিকে রুজভেল্টের 'নিউ ডিস্ক' কার্যক্রমের জৌলুষ আস্তে আস্তে ম্লান হয়ে এল। আমেরিকার অর্থনীতিতে আবার মন্দাভাব ফিরে আসতে লাগল এবং সঙ্গে সঙ্গে বেকারিত্ব বাড়তে লাগল। আমেরিকার রাজনৈতিক-সামাজিক জীবনের উদারনৈতিক আবহাওয়াও ক্রমশ রক্ষণশীলতার দিকে মোড় নিতে আরম্ভ করল। স্কুলের জীবনেও নেমে এল এক অস্থিরতা এবং পারস্পরিক মনোমালিন্যের বাতাবরন। এর একটা কারণ অবশ্যই ছিল অর্থনৈতিক। কিন্তু মোটেই একমাত্র কারণ ছিল না। তার সঙ্গে যোগ হয়েছিল ইনস্টিটিউটের পরিচালকদের ক্রমবর্দ্ধমান রক্ষণশীলতাজনিত মতপার্থক্য। ইনস্টিটিউট পরিচালনায় গণতান্ত্রিকতার কিছুটা অভাবও অনেক তিক্ততার সৃষ্টি করেছিল। বস্তুত বরাবরই ইনস্টিটিউটে একটা অদৃশ্য অন্তর্বৃত্ত এবং বহির্বৃত্তের টানাপোড়েন ছিল। লোয়েনথল, পোলক এবং হর্কহাইমার প্রতিষ্ঠাতা সোসাইটির ট্রাস্টি হিসাবে (এবং হর্কহাইমার পরিচালক হিসেবে) ইনস্টিটিউটের ফাণ্ড ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে ছিলেন। এঁরা স্কুলের পরিচালনার ব্যাপারে কিছুটা গোপনীয়তা বজায় রাখার চেষ্টা করতেন। তাছাড়া হর্কহাইমারের আর্থিক প্রয়োজনটা এঁরা অন্যদের চেয়ে একটু বেশি গুরুত্বের সঙ্গে দেখতেন। এবং এ-ব্যাপারে কোনও সন্দেহ ছিল না যে ইনস্টিটিউটের আর্থিক অবস্থা তখন বিশেষ ভাল ছিলনা। তাই তাঁরা চাইতেন যে স্কুলের সঙ্গে যুক্ত যাঁরা ছিলেন তাঁরা অধ্যাপনা বা ব্যক্তিগত গবেষণা প্রকল্পের মাধ্যমে নিজেদের আর্থিক সংস্থান করে নেবেন এবং সেই সঙ্গে চেষ্টা চলবে ইনস্টিটিউটের জন্য অর্থকরী গবেষণা প্রকল্প সংগ্রহ করার চেষ্টা। তাই বহির্বিশ্বের কাছে তাঁরা নিজেদের মার্ক্সবাদী বা র‍্যাডিকাল পরিচয়টা গোপন রাখাটা উচিত হবে বলে মনে করতেন। তাঁরা নিজেদের ক্রিটিকাল থিয়োরিষ্ট হলে অভিহিত করতেন। কিন্তু পোলক এবং নয়ম্যান তাঁদের লেখায় একাধিকবার ন্যাশনাল সোশ্যালিজমকে স্টেট ক্যাপিট্যালিজমের এক বিশেষ রূপ বলে তুলে ধরলেন। এটা আমেরিকার শিক্ষিত সমাজের কাছে ইনস্টিটিউটকে মোটেই জনপ্রিয় করেনি। এই সময়েই দেখা যাচ্ছে প্রবাসী জার্মান এবং বিশেষ করে ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে ইনস্টিটিউট বিরোধী একটা মনোভাব গড়ে উঠছে। তাঁরা ইনস্টিটিউটকে একটা সাম্যবাদী প্রতিষ্ঠান হিসাবেই মনে করতে আরম্ভ করলেন। নিউ স্কুল অব্ সোশ্যাল রিসার্চ যেটা একটা প্রগতিবাদী প্রতিষ্ঠান হিসাবেই কাজ শুরু করেছিল তার সঙ্গেও ইনস্টিটিউটের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠল। এর সঙ্গে মড়ার ওপর খাঁড়ার

মায়ের মতো এল জার্মানী এবং সোভিয়েটের মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি যা ইনস্টিটিউটের গ্রহণ-যোগ্যতার ওপর সরাসরি আঘাত করল।

১৯৩৮ সালে আমেরিকান ইহুদি ফাউন্ডেশনের কাছে 'রিসার্চ প্রজেক্ট অন অ্যান্টি-সেমিটিজম' নামে একটি গবেষণা প্রকল্পের খসড়া জমা দিয়ে ইনস্টিটিউট অর্থ সাহায্যের জন্যে আবেদন করলে বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে সেটি ফেলে রাখা হয়। 'কালচারাল আসপেক্টস অন ন্যাশনাল সোশ্যালিজম' নামে আর একটি গবেষণা প্রস্তাব পাঠানো হয় রকফেলার ফাউন্ডেশনের কাছে। হ্যারল্ড ল্যাসওয়েল নিজে এই প্রস্তাবটি অনুমোদন করে অর্থসাহায্যের জন্য সুপারিশ করেন। সেটিও ফেলে রাখা হয়। কিছুদিনের জন্যে রিসার্চ ফাণ্ড পাওয়া সত্যিই খুব কঠিন হয়ে ওঠে। ইনস্টিটিউটের গবেষণা বাবদ বরাদ্দও ছাঁটকাট শুরু হোল।

১৯৩৯ সালে হর্কহাইমার বেঞ্জামিনকে সরাসরি জানিয়ে দিলেন যে স্কুলের পক্ষে তাঁকে আর কোনও অর্থসাহায্য দেওয়া সম্ভব হবেনা। ঐ বছরই পোলক ফ্রোমকে জানালেন যে তাঁর মাসিক বরাদ্দও স্কুল বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছে। নয়ম্যানকেও এক বছরের মধ্যে অন্য কোনও চাকরি সংগ্রহ করতে বলা হল। পোলক চাইছিলেন নয়ম্যান ও মার্কিউস কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়েই কোনও চাকরির চেষ্টা করুন। আর অন্যদিকে হর্কহাইমার তাঁর গবেষণায় অ্যাডোর্নো আর মার্কিউস দু'জনেরই সাহায্য চাইছিলেন। অন্যরাও মোটামুটিভাবে বুঝতে পারলেন যে অদূর ভবিষ্যতে তাঁদেরও স্কুলের বাইরে কাজের সন্ধান করতে হতে পারে।

কিন্তু এই সমস্ত অস্থিরতা, অনিশ্চিতি এবং অস্বস্তি সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে ১৯৪১-৪২ সালে স্কুলের চিন্তাবিদরা একাধিক প্রথম শ্রেণির গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং সবই ইংরেজি ভাষায়। যার ফলে বুদ্ধিজীবীমহলে স্কুলের নাম একটা শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করল। এই সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে ছিল মার্কিউসের Reason and Revolution (১৯৪১), ফ্রোম এর Escape from freedom এবং নয়ম্যানের Behemoth (১৯৪২)। ১৯৪১ সালে অ্যাডোর্নোর Philosophy of Modern Music নামে দীর্ঘ প্রবন্ধটিও প্রকাশিত হয়। ১৯৪৪ সালে হর্কহাইমার অ্যাডোর্নোর সঙ্গে Philophical Fragments বইটি প্রকাশ করেন।

ইনস্টিটিউটের এই অবস্থায় ম্যাকাইভারের কাছ থেকে একটা প্রস্তাব এলো যে ইনস্টিটিউট কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে গিয়ে তার পঠন-পাঠন গবেষণার ব্যাপারে নিয়মিত সহযোগী হয়ে উঠুক। ইনস্টিটিউটের পরিচালকরা অবশ্য এই প্রস্তাব গ্রহণ করেননি কারণ তাঁরা আশঙ্কা করেছিলেন যে এর ফলে স্কুলের স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা কমে যাবে। এইসব টানাপোড়েনের মধ্যে শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়াল তা হল এই যে হর্কহাইমার লস এঞ্জেলসে চলে গেলেন আর ইনস্টিটিউটের ভগ্নাবশেষ নিউইয়র্কে পড়ে রইল।

১৯৪২ সালের জানুয়ারি মাস নাগাদ এটা বোঝা গেল যে খুব শিগ্‌গির কোনও বড় ধরনের গবেষণা প্রকল্প (যেটা স্কুলকে ধরে রাখতে পারে) পাবার আশা খুব কম। নয়ম্যান তখন প্রায় বেকার। শেষ পর্যন্ত পার্ল হারবারের পরে আমেরিকা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পুরোপুরি জড়িয়ে পড়ার পর নয়ম্যান সরকারী চাকরী নিয়ে ওয়াশিংটন চলে যান। ১৯৪৩ সালে আমেরিকান সুইস কমিটি শেষ পর্যন্ত অ্যান্টি-সেমিটিজ্‌ম্ প্রজেক্টের জন্য অর্থ বরাদ্দ করলে নয়ম্যান আবার ইনস্টিটিউটে

ফিরে আসতে চান। কিন্তু হর্কহাইমার তাঁকে পাকা চাকরি ছেড়ে আসতে বারণ করেন। এর পরও দেখা যাচ্ছে ১৯৪৬ সালে পোলকের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের পরে নয়ম্যান লিখছেন যে তিনি আবার ইনস্টিটিউটে ফিরে আসতে চান।

মার্কিউস ১৯৪১ সালের মে-মাসে সস্ত্রীক লস এ্যাঞ্জেলসে চলে যান এবং সান্টা মোনিকাতে একটা ভাড়া বাড়িতে থাকতে শুরু করেন। ঐ অঞ্চলে তখন অনেক বুদ্ধিজীবী বসবাস করছিলেন। ঐ সময়ের এক চিঠিতে হর্কহাইমার পোলককে লেখেন যে ঐ বাড়িরই একটা অংশে ইনস্টিটিউটের অফিস এবং লাইব্রেরি খোলা যেতে পারে। আর গ্রসম্যানও ওখানে এসে থাকতে পারেন। হর্কহাইমারের ইচ্ছে ছিল ক্রমে ক্রমে পোলক, অ্যাডোর্নো ছাড়াও সম্ভব হলে লোয়েনথল এবং কার্শহাইমারকেও ওখানে নিয়ে আসার। কিন্তু মার্কিউসকে মাসে তিনশ ডলারেরও কম মাইনে দেওয়া হত। তাই কিছু দিনের মধ্যেই মার্কিউস Bureau of Intelligence, office of war information-এর সিনিয়র অ্যানালিস্টের পদে যোগ দিয়ে ওয়াশিংটন চলে আসেন। দেখা যায় ১৯৪৩ সালের মধ্যে স্কুলের অন্তত ছ'জন পূর্ণ সহযোগী আমেরিকান সরকারী দপ্তরে কাজ করছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন নয়ম্যান, মার্কিউস, কার্শহাইমার, গারল্যাণ্ড, লোয়েনথল এবং পোলক। স্কুলের প্রথম সারির তাত্ত্বিক গবেষকদের মধ্যে শুধু হর্কহাইমার এবং অ্যাডোর্নোই সরকারী দপ্তরের বাইরে থেকে তাঁদের 'ডায়ালেকটিকস্ প্রজেক্ট' নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করেন। স্কুলের কাজকর্মে একটা ভাঁটা আসে। এই প্রসঙ্গে হর্কহাইমার-অ্যাডোর্নোর যে-লেখাগুলি পরবর্তী সময়ে বুদ্ধিজীবী মহলে বিশেষ আলোচনা সৃষ্টি করেছিল এবং যেগুলোর প্রাথমিক খসড়া এই সময়ে তৈরি হয় সেগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। সেগুলি হল, অ্যাডোর্নোর Reflections on class theory, Mass culture এবং Culture Industry-র বিশ্লেষণ। আর ছিল হর্কহাইমার-অ্যাডোর্নোর যৌথ চিন্তার ফসল, ব্যবহারিক দর্শনের ওপর কান্ট এবং আলোকপ্রাপ্তির প্রভাব। যেটা পরে Dialectic of Enlightenment : Eclipse of Reason হিসাবে চূড়ান্ত রূপ পায়।

পশ্চিম উপকূলের এইসব তাত্ত্বিক গবেষণার পাশাপাশি পূর্ব উপকূলে তখন একটাই বড় প্রকল্পের কাজ চলছিল। সেটা হল ইহুদি বিদ্বেষের ওপর গবেষণা। যুগ্মভাবে পরিচালিত এই প্রকল্পের তত্ত্বাবধায়করা ছিলেন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাকাইভার আর ইনস্টিটিউট থেকে পোলক। পল ম্যাসিং, আর্কাডি গারল্যাণ্ড আর লোয়েনথল এই প্রকল্পের সহযোগী হিসেবে কাজ করেছিলেন। ঠিক হয়েছিল এই গবেষণার এম্পিরিক্যাল অংশটির দায়িত্বে থাকবে নিউইয়র্ক শাখা আর তাত্ত্বিক-দার্শনিক-মনস্তাত্ত্বিক দিকের দায়িত্বে থাকবেন হর্কহাইমার এবং অ্যাডোর্নো। আমেরিকান জুইস কমিটি প্রথমে এক বছরের জন্য অর্থ যোগাবার প্রতিশ্রুতি দেয়। পরে প্রকল্পটি আরও অনেক বর্ধিত আকার ধারণ করলে কমিটির কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুদান পেতে কোনও অসুবিধা হয়নি।

অত্যন্ত ধনী এবং ক্ষমতাসম্পন্ন এই সংস্থাটির দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের পিছনে হয়তো দুটো কারণ কাজ করেছিল। একটি পরোক্ষ এবং অপরটি প্রত্যক্ষ। পরোক্ষ কারণটি হল আমেরিকার কালো মানুষের সমস্যার যথার্থ অনুধাবন এবং বিশ্লেষণের জন্য সুইডিশ অর্থনীতি-এবং-

সমাজতত্ত্ববিদ গুনার মিরড্যালকে একটি গবেষণা-ভিত্তিক প্রতিবেদন তৈরির কাজ দেওয়া হয়েছিল ১৯৩৭ সালে। এই রিপোর্টটি বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই আমেরিকার বুদ্ধিজীবীমহলে বিশেষ সাড়া পড়ে যায়। ইহুদি বিদ্বেষের ওপর গবেষণার প্রস্তাবটি তখন একটা নতুন মাত্রা পেতে শুরু করে। এরই সঙ্গে আর একটি ঘটনাও ঘটল। যেটাকে আমরা প্রত্যক্ষ কারণ বলতে পারি। ১৯৩৮ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর জার্মানীতে তথাকথিত স্ফটিক-রাত্রি পালিত হয়। ঠিক তার কয়েকদিন পরে ৯ই এবং ১০ই ডিসেম্বর সমস্ত জার্মানী জুড়ে সমস্ত ইহুদি উপাসনাগৃহগুলি পুড়িয়ে ধ্বংস করে ফেলা হল। ঐ দুদিনেই প্রায় তিরিশ হাজার ইহুদি নারী পুরুষ ও শিশুকে গ্রেপ্তার করে কন্সেনট্রেশন্ ক্যাম্পে পাঠানো হল। আমেরিকার ইহুদিদের ইমিগ্রেশন কোটা বাড়ানোর জন্যে চতুর্দিক থেকে সরকারের ওপর চাপ আসতে লাগল। এই বাতাবরনে ইহুদি বিদ্বেষের প্রশ্নটি একেবারে সামনে চলে এল। কমিটির কাছে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের লোকজন আর অপাংক্তেয় রইলেন না। ১৯৪৪ সালের শেষের দিকে এ.জে.সি.-র একটি বিজ্ঞান বিভাগ তৈরির ভার হর্কহাইমারকে দেওয়া হয়। ১৯৪৪ সালে ইহুদি-বিদ্বেষ সংক্রান্ত গবেষণা প্রকল্প থেকে উদ্ভুত একটি নতুন প্রকল্পের জন্য অর্থ বরাদ্দ করতে এ.জে.সি কোন কালহরণ করে নি। আর এই প্রকল্পের তৃতীয় ভাগ ইহুদি বিদ্বেষ এবং শ্রমিক শ্রেণির জন্য অর্থবরাদ্দের অনুরোধ যখন এল তখন সাগ্রহে এ.জে.সি তা' অনুমোদন করল। এর অন্যতম কারণ অবশ্য ছিল এই যে এই প্রস্তাব অনুমোদন করেছিলেন মার্গারেট মীড, পল ল্যাজার্সফেল্ড, রবার্ট মারটন এবং রুডলফ্ লোয়েনস্টাইনের মতো সদস্যরা। হর্কহাইমার ১৯৪৩ সালের মে মাসে ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে সেখানে যান। সেখানে অন্যান্য কাজকর্মের মধ্যে তিনি বিশেষভাবে ওখানকার মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক নেভিট স্যানফোর্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। কারণ তাঁর মনোসমীক্ষণ সংক্রান্ত কাজকর্ম হর্কহাইমারের কাছে অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক এবং আকর্ষণীয় বলে মনে হয়েছিল। স্যানফোর্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের প্রথম সুযোগেই তিনি ইনস্টিটিউটের ইহুদি বিদ্বেষ সংক্রান্ত গবেষণা প্রকল্পে যোগ দিয়ে স্কুলের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হবার আহ্বান জানান। স্যানফোর্ডও সেই প্রস্তাব অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেন এবং ইহুদি বিদ্বেষের তৃতীয় পর্বের গবেষণা প্রস্তাবটি রচনার কাজে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হন। এভাবেই বার্কলে প্রকল্পের শুরু। পরে অ্যাডোর্নো এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হলে প্রকল্পের মান আরও বৃদ্ধি পায়। ইহুদি-বিদ্বেষ সংক্রান্ত গবেষণা প্রকল্পটি আস্তে আস্তে এক বিশাল প্রকল্পের রূপ নেয় যার ফলে অনেক নবীন এবং তরুণ গবেষকের সহায়তার প্রয়োজন হয়। এর ফলে স্কুলের প্রথম সারির গবেষকদের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও নিউইয়র্কের শাখাটি ক্রমশ বেড়ে উঠতে থাকে। কিন্তু এই সময়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতির আবার পটপরিবর্তন হল এবং তার প্রভাব ইনস্টিটিউটের ওপরেও পড়ল।

প্রত্যাবর্তন : প্রস্তুতিপর্ব

১৯৪৫ সালের মে মাসে মিত্রশক্তি জার্মানীতে প্রবেশ করতে শুরু করে আর মে মাসে জার্মানী আত্মসমর্পন করে। হর্কহাইমার এবং অ্যাডোর্নো তখন তাঁদের নিজেদের গবেষণা এবং অ্যান্টি-সেমিটিজম্ প্রকল্প নিয়ে ব্যস্ত। এঁরা দুজনেই তখন আমেরিকার নাগরিক। আর যাকে বলা হত 'হর্কহাইমার সার্কল' তাঁদের বাদ দিয়ে স্কুলের লোকজন এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়েছেন। ইনস্টিটিউট থেকে এই বিচ্ছেদের জন্যে তাঁরা সব সময়েই মর্মবেদনা অনুভব করতেন। কিন্তু

হর্কহাইমার সার্কল তাঁদের সবাইকেই ফিরে পেতে চেয়েছিলেন এমনটা মনে হয়না। এই হর্কহাইমার সার্কল ছিল হর্কহাইমারকে বাদ দিয়ে মূলত চারজনকে নিয়ে—পোলক, ইনস্টিটিউটের যুগ্ম পরিচালক এবং একেবারে ভিতরের লোক, লোয়েনথল, নানান কাজের কাজী এবং দক্ষ সহকারী অ্যাডোর্নো, হর্কহাইমারের প্রতি বিশ্বস্ত এবং তাঁর গবেষণার সহকর্মী এবং ফেলিক্স ভাইল, ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রতিপালক। যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই ১৯৪৫ সালের মাঝামাঝি ফেলিক্স ভাইল ইনস্টিটিউটকে নতুন করে এক লক্ষ ডলার দিলেন যাতে আগামী দিনে আর বাইরে থেকে গবেষণা প্রকল্প না আনতে হয় আর ইনস্টিটিউট পূর্নোদ্যমে তার নিজের কাজকর্ম করতে পারে।

আগেই বলা হয়েছে যে নয়ম্যান, মার্কিউস এবং কার্শহাইমার তিনজনেই যুদ্ধ দপ্তরে কাজ নিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে মার্কিউসই হর্কহাইমারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চললেও তাঁকেও একটু দূরত্বে রাখা হত। নয়ম্যানকে প্রয়োজন হত মুখ্যত আইনগত কারণে। আর কার্শহাইমারের কাছ থেকেও মাঝে মাঝে আইনগত পরামর্শ নেওয়া হত। যুদ্ধের পর পঞ্চাশের দশকে তাঁরা বিভিন্ন আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন। আর ভিটফোগেলের সঙ্গেও সম্পর্ক কমে আসছিল। তাঁর চীন প্রকল্পের জন্যে ইনস্টিটিউট প্রয়োজনীয় অর্থের পুরোটা দিতনা। খরচের একটা বড় অংশ আসত ইনস্টিটিউট অব্ প্যাসিফিক রিলেশন্স থেকে। আর ১৯৪৭ সালে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আর সীয়্যাটলের ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয় চীন প্রকল্পের ব্যয়ভার পুরোপুরি বহন করতে শুরু করলে শেষ যোগাযোগটুকুও ছিন্ন হয়ে যায়।

১৯৪৫ সালে একপ্রস্থ যুদ্ধ শেষ হল, কিন্তু শুরু হল আর এক নতুন যুদ্ধ, যেটাকে আমরা 'ঠাণ্ডা লড়াই' বলে জানি—'কমিউনিস্ট' আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তথাকথিত 'মুক্ত দুনিয়ার' গণতন্ত্র রক্ষার জন্য সারা পৃথিবীব্যাপী লড়াই। যেটা কৌতুকের ব্যাপার সেটা হল এই যে এই যুদ্ধের প্রথম বলি হল আমেরিকান গণতন্ত্র—তার নিজের দেশে। সমস্ত দেশ জুড়ে একটা অত্যন্ত রক্ষণশীল এমনকি প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব গড়ে উঠল। তার সঙ্গে এল তীব্র সাম্যবাদ বিদ্বেষ। এরই চূড়ায় বসল সিনেটর ম্যাককার্থির কমিটি। ম্যাককার্থি হলেন ওঝা, আর তাঁর প্রধান কাজ হল দেশজুড়ে কমিউনিস্টভুত খোঁজা আর সেই ভুত তাড়ানো। সর্বক্ষেত্রে এই ভূত-সন্ধান শুরু হলেও ম্যাক্‌কার্থির বিশেষ নজর ছিল শিল্পী, সাহিত্যিক, সংস্কৃতিকর্মী, বিজ্ঞানী, গবেষক এবং অধ্যাপক ও তাঁদের প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি। ইনস্টিটিউটের একজন তরুণ কর্মী মোজেস ফিঙ্কেলস্টাইন ঐ-কমিটির শিকার হলেন। এমনকি ইনস্টিটিউট অব্ সোশ্যাল রিসার্চ আর ইনস্টিটিউট অব্ প্যাসিফিক রিলেশন্‌সের সঙ্গে যোগাযোগ থাকার অপরাধে ভিটফোগেলকেও ম্যাক্‌কার্থি কমিটির সামনে হাজিরা দিতে হল।

এই পরিবেশে ইনস্টিটিউটের অনেকেই অস্বস্তি এবং নিরাপত্তার অভাব বোধ করতে লাগলেন। অ্যাডোর্নো তো বলতে আরম্ভ করলেন যে হিটলার-পরবর্তী জার্মানী বোধ হয় এর চেয়ে খারাপ হবে না। এটা অবশ্য সর্বাংশে সত্য ছিল না। সেখানেও ঠাণ্ডা লড়াইয়ের হাওয়া লেগেছিল। প্রচ্ছন্ন কমিউনিস্ট প্রীতির অভিযোগ এনে বিভিন্ন শহরে গড়ে ওঠা ফ্যাসী-বিরোধী কমিটিগুলি ভেঙে দেওয়া আরম্ভ হল। একেবারে মার্কা-মারা নাৎসী ছাড়া বাকি সবাইকেই প্রশাসনে

পুনর্বহাল করা হল। এসব খবরও তাঁদের কাছে পৌঁছোতে আরম্ভ করল। 'হর্কহাইমার সার্কল' ভীষণ দোটানায় পড়লেন। তাঁরা এটা বুঝতেন যে যে-ধরনের কাজ তাঁরা করতে চান তার উপযুক্ত ক্ষেত্র হল ইউরোপ, আমেরিকা নয়। কিন্তু তবু তাঁরা আমেরিকায় নতুন করে যে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছেন, এবং নিজের প্রতিভা এবং প্রচেষ্টার জোরে যে-প্রতিষ্ঠা আদায় করতে পেরেছেন হঠাৎ সেটা ছেড়ে আসতেও তাঁদের কম দ্বিধা ছিলনা।

১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে ইনস্টিটিউট কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের সঙ্গে যৌথভাবে ন্যাশনাল সোশ্যালিজম্ এর ওপর এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। এখানে অ্যাডোর্নো যে-বক্তৃতা দেন তার কিছু কিছু অংশ ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের তখনকার চিন্তাধারা বোঝার জন্যে বিশেষ মূল্যবান। অ্যাডোর্নো তাঁর বক্তৃতায় এক জায়গায় বলেন, হিটলার সমকালীন সমাজের বিশেষ এক প্রবণতার বাস্তব প্রতিফলন, যে-প্রবণতা হিটলারের আগেও ছিল এবং নিশ্চিতভাবে বলা যায় পরেও থাকবে। এই প্রবণতা হল সমস্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণিগুলির মধ্যে ক্রমবর্ধমান সংস্কৃতিবিমুখতা। বর্তমান সমাজ-সংস্কৃতির সমস্ত ক্ষেত্র থেকেই তার প্রাণস্বরূপকে নির্বাসিত করেছে, বিশেষ করে শিল্প-সাহিত্য থেকে। সংস্কৃতি এখন একটি পণ্য, একটা ব্যবসার জিনিস। তিনি আরও বললেন, 'it is this lack of experience of the imagery of real art, partly substituted and parodied by the readymade stereotypes of the amusement industry, which is at least one of the formative elements of that cynicism that has finally transformed the Germans, Beethoven's people, into Hitler's own people'। এই প্রেক্ষাপটে বুদ্ধিজীবীরা একটাই কাজ করতে পারেন, সেটা হল 'to give expression to negativity, to call the catastrophe by name'।

ঐ সময় নাগাদ মার্কিউস ইউরোপ গেলে হর্কহাইমার তাঁকে জার্মানির অবস্থা ভাল করে দেখে আসতে বলেন। মার্কিউস লন্ডন এবং প্যারিস গেলেও জার্মানী যেতে পারেননি। লণ্ডনে কার্ল ম্যানহাইম এবং রিচার্ড লোয়েনথল এবং প্যারিসে রেমণ্ড এ্যারন এবং জাঁ ওয়হলের মতন অনেকেই অনুরোধ করছেন ইনস্টিটিউটের জার্নাল আবার প্রকাশ করতে। কিন্তু তখন হর্কহাইমার এ-বিষয়ে ততটা উৎসাহিত হননি। তার একটা কারণ হল যে যথেষ্ট উচ্চস্তরের লেখা নিয়মিত পাওয়া যাবে কিনা সে বিষয়ে হর্কহাইমারের কিছুটা সন্দেহ ছিল। তার চেয়েও যে কারণটা বড় ছিল সেটা হল হর্কহাইমারের মনে এমন সন্দেহও ছিল যে ইনস্টিটিউটের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত মানুষজনও বোধহয় আগের মতো একইভাবে ভাবছেন না। এই অবস্থায় জার্নাল বের হলে তাঁদের ধ্যান-ধারণা এবং চিন্তার সাযুজ্যের চেয়ে বিরোধটাই প্রকাশ্যে চলে আসবে। সেটা ইনস্টিটিউটের পক্ষে খুব ভাল হবেনা। তাছাড়া তখনও ইনস্টিটিউটের মধ্যে পূর্ব উপকূলের এম্পিরিকাল গবেষণা এবং পশ্চিম উপকূলের তাত্ত্বিক গবেষণার মধ্যে টানাপোড়েন চলছে। আর মার্কিউসের লেখার মধ্যে, হর্কহাইমার মনে করছিলেন, অত্যন্ত উগ্র মার্ক্সবাদ প্রকাশ পাচ্ছে। এই সময়ে প্রত্যক্ষবাদের ওপর ইনস্টিটিউট থেকে যে সব লেখা প্রকাশিত হয়েছিল তার প্রায় সবগুলিই ছিল অ্যান্টি-সেমিটিজম প্রকল্পের বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন দিকগুলি নিয়ে ছোট ছোট পুস্তিকা।

হর্কহাইমারের কাছে যুদ্ধ-পরবর্তী জার্মানী স্বচক্ষে দেখার প্রথম সুযোগ আসে ১৯৪৮ সালে যখন রকফেলার ফাউণ্ডেশনের বৃত্তি নিয়ে অতিথি অধ্যাপক হিসাবে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলে কিছুদিন কাটাতে

যান। যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাত্র কয়েকবছর আগেই তিনি বিতাড়িত হয়েছিলেন সেখানেই এখন তিনি সাদর অভ্যর্থনা পান। তবে সেটা একজন পুরোনো সহকর্মী যাঁর ওপর অবিচার করা হয়েছিল সেই হিসেবে না একজন প্রভাবশালী আমেরিকান হিসেবে সেটা তিনি নিজেও ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি। এর আগে ১৯৪৬ সালে ফেলিক্স ভাইলকে ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে ইনস্টিটিউটকে আবার ওখানে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে অনুরোধ করা হয়। তার উত্তরে ফেলিক্স জানতে চান সোসাইটি ফর সোশ্যাল রিসার্চকে রেজিস্ট্রার অব সোসাইটিস আবার রেজিস্টার্ড সোসাইটি হিসেবে অনুমোদন করেছে কিনা। আর ইনস্টিটিউটের বাজেয়াপ্ত করা জমি ও অন্যান্য সম্পত্তি তাঁদের আবার ফিরিয়ে দেওয়া হবে কিনা।

১৯৪৯ সালে হর্কহাইমার আবার ফ্রাঙ্কফুর্ট আসেন। এবার তাঁর সঙ্গে ছিলেন পোলক। এবার হর্কহাইমারকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁর সমাজদর্শনের পুরোনো পদটি ফিরিয়ে দেন। যেহেতু আগেই ১৯৪৬ সালে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ইনস্টিটিউট তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল এবং যে বাড়ি থেকে ইনস্টিটিউটের কাজকর্ম চলতো সেটাও বিশ্ববিদ্যালয়কে ফিরিয়ে দিয়েছিল তাই এখন ফ্রাঙ্কফুর্টে ফিরে আসার ব্যাপারে আর বিশেষ কোনও বাধা রইলনা। অবশ্য প্রথম দিকে ফ্রাঙ্কফুর্টের অফিসকে নিউইয়র্ক অফিসের এক শাখা হিসাবেই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে অ্যাডোর্নোও ফ্রাঙ্কফুর্ট ফিরে এলেন। তখনও সরকারীভাবে তিনি হর্কহাইমারের সহকারী। এই সময় গাডামার হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকপদ নিয়ে চলে যাবার সময় তাঁর জায়গায় অ্যাডোর্নোর নাম প্রস্তাব করেন। কিন্তু ১৯৫৬ সালের আগে অ্যাডোর্নো পূর্ণ অধ্যাপকপদ পান নি।

১৯৫০ সালের গোড়ায় হর্কহাইমার পাকাপাকিভাবে ফ্রাঙ্কফুর্ট চলে আসেন। কিন্তু যেহেতু তখনও তাঁরা মার্কিন নাগরিক তাই হর্কহাইমার এবং অ্যাডোর্নোকে মাঝে মাঝেই আমেরিকা যেতে হত। বিশাল মার্কিন সৈন্যবাহিনীর উপস্থিতি এবং মার্শাল প্লান প্রভাবিত তখনকার জার্মানীকে তাঁদের মনে হয়েছিল একটা উপনিবেশ, যেখানে ফ্যাসিবাদের জায়গা নিয়েছে কমিউনিস্ট বিদ্বেষ। সেখানকার বুদ্ধিজগতকে মনে হয়েছিল অবাস্তব, যার সঙ্গে অতীতের কোনও যোগ নেই। সেটা যেন একগুচ্ছ কাটা ফুলের মতো যা বাইরে থেকে কেউ এসে ফুলদানিতে সাজিয়ে রেখেছে। তবুও তাঁরা ভাবলেন ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগসূত্রহীন এই জার্মান সমাজে তাঁদের চিন্তাভাবনার যেটুকু মূল্য আছে মার্কিন সমাজে সেটুকুও নেই।

জার্মানীতে ফিরে আসার পরে আমেরিকায় যেসব গবেষণার কাজ চলছিল তার কিছু কিছু 'স্টাডিস ইন প্রেজুডিস' (studies in Prejudice) নামে একে সিরিজে প্রকাশিত হতে থাকে। তার মধ্যে বার্কলে গবেষণারও অংশবিশেষ ছিল। বার্কলে গবেষণায় যে প্রশ্নতালিকা ব্যবহার করা হয়েছিল সেগুলি বিশ্লেষণ করে এটা দেখা গিয়েছিল জাতিবাদী পূর্বসংস্কারের সঙ্গে ফ্যাসিবাদী মানসিক প্রবণতার একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। এই লেখা প্রকাশ হবার পরে অ্যাডোর্নোর হাতে সার্ত্রের একটি প্রবন্ধ আসে। এ্যাডোর্নো বলেন, আমি অবাক হয়ে দেখলাম আমরা আমাদের অভিজ্ঞতাবাদী এবং সংখ্যাতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে যেটুকু ধরতে পেরেছি সার্ত্র তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং সংবেদনশীল মন নিয়ে সেটা আগেই ধরতে পেরেছেন। অ্যাডোর্নোর কাছে এটা

ছিল মার্কিন গবেষণা পদ্ধতির চেয়ে ইউরোপীয় মানবিক দার্শনিক চিন্তাপদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্বের আরও একটি প্রমাণ। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের এই দৃষ্টিভঙ্গি আর কিছুদিন পরের দৃষ্টবাদী বিতর্কের সময় আরও সুস্পষ্ট রূপ নেয়। 'প্রভুত্ববাদী ব্যক্তিত্বে'র শেষ অধ্যায়ে সার্ত্র লিখছেন, 'There is a marked similarity between the syndrome which we have labelled the authoritarian pesonality and the 'Portrait of an Anti-Semite' by Jean Paul Sartre. Sartre's brilliant paper became available to us after all our data had been collected and analyzed. That his phenomenological portrait should resemble so closely, both in the general structure and in numerous details, the syndrome which slowly emerged from our empirical observations and qnantitative analysis, seems to us remarkable.'

বিধ্বস্ত সমাজে

হর্কহাইমার,অ্যাডোর্নো আর পোলক যখন ফ্রাঙ্কফুর্টে পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু করে ইনস্টিটিউটের নবপ্রতিষ্ঠিত 'জার্মান শাখা'টিকে গড়ে তোলার চেষ্টা আরম্ভ করলেন তখন তাঁরা দেখলেন পুরোনো জার্মানীর অনেক কিছুই এমনভাবে ভেঙে গেছে যে তাকে আর বোধহয় নতুন করে গড়ে তোলা সম্ভব হবেনা। এর মধ্যে যেটা তাঁদের কাছে সবচেয়ে মর্মান্তিক মনে হয়েছিল তা হল জার্মানীতে 'জার্মান-ইহুদি' ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ মূলোৎপাটন। এর সঙ্গে ছিল সমাজতন্ত্রের প্রতি প্রচণ্ড বিরোধিতা। এর মধ্যে তাঁরা নিজেদের প্রায় পরবাসী বলে মনে করতে লাগলেন। কারণ তাঁরা ছিলেন একে ইহুদি, তায় বামপন্থী বুদ্ধিজীবী এবং সর্বোপরি মার্ক্স-ঘেঁষা 'সমীক্ষণী-তাত্ত্বিক'। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁদের সহকর্মীদের মধ্যে একমাত্র উলফগ্যাঙ্ অ্যাবেনডর্থই ছিলেন সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। দীর্ঘদিন জার্মানী থেকে বহুদূরে প্রবাস জীবন যাপনের ফলে শ্রমিক আন্দোলন এবং প্রতিষ্ঠানবিরোধী রাজনীতির সঙ্গেও তাঁদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। বরং হর্কহাইমারের সূত্রে তাঁদের বেশি যোগাযোগ ছিল সরকারের ওপরতলার কিছু কিছু মানুষের সঙ্গে। ১৯৫০ সালে এক বছরের জন্যে ডীন নির্বাচিত হবার সুবাদে তাঁর প্রতিষ্ঠা অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল। পরে তিনি আবার দু'বছরের জন্যে রেক্টরও নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাই প্রথমদিকে এঁদের কাছেই তাঁরা সাহায্যের আবেদন করলেন। হর্কহাইমারের তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং সাংগঠনিক ক্ষমতা এই সময়ে বিশেষ কাজে লেগেছিল। একদিকে তিনি যেমন আবার ইনস্টিটিউটকে একটা আর্থিক দঢ়ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে সচেষ্ট হলেন, তেমনি ইনস্টিটিউটের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াবার প্রচেষ্টায় তিনি জানিয়ে দিলেন যে বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে যতটা সম্ভব ততটাই তাঁরা জার্মানীর পুনর্গঠনের কাজে সাহায্য করতে আগ্রহী। কিন্তু এই পুনর্গঠন হবে কোন্ জার্মানীর এবং কীভাবে তা তখনকার মতো উহ্যই রয়ে গেল। হর্কহাইমার জানতেন যে ফেলিক্স ভাইলের ব্যবসা বহুভাবে মার খাওয়ার ফলে তাঁর পক্ষে ইচ্ছে থাকলেও আর ইনস্টিটিউটকে দরাজ হাতে আর্থিক সাহায্য করা সম্ভব নয়। তাই আমেরিকায় থাকাকালীন ল্যাজার্সফেল্ড কিভাবে ইনস্টিটিউটকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে গবেষণা চুক্তি সংগ্রহ করার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরতেন (এবং যেটা হর্কহাইমারদের মোটেও ভাল লাগতনা।) এখন তাঁরাও সেই পথেই হাঁটতে শুরু করলেন। জার্মানীর নামকরা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে শিল্পভিত্তিক সমাজতত্ত্বের ওপর এক বা একাধিক গবেষণা প্রকল্প নেওয়া যায় কিনা সেবিষয়েও ভাবনাচিন্তা শুরু করলেন।

এইসব প্রচেষ্টার ফল পেতে বেশি দেরি হয়নি। জার্মানীতে মার্কিন দূতাবাস থেকে ইন্‌স্টিটিউটের জন্যে এককালীন দুলক্ষ ডয়েসমার্ক সাহায্য পাওয়া গেল। তার সঙ্গে ছিল ইনস্টিটিউটকে নতুনভাবে গড়ে তোলার জন্য আরও দু'লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার ডয়েশমার্কের প্রতিশ্রুতি। এই বদান্যতার অন্যতম কারণ ছিল এই যে মার্কিন রাষ্ট্রদূত মনে করেছিলেন ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে মার্কিন সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার অভিজ্ঞতাবাদী ধারা জার্মানীতে চালু করা সম্ভব হবে। এইসময় ফ্রাঙ্কফুর্ট পৌরপরিষদ ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ইনস্টিটিউটের যুদ্ধ বিধ্বস্ত পুরোনো বাড়িটা সোসাইটি ফর সোশ্যাল রিসার্চের কাছ থেকে এক লক্ষ ডয়েসমার্ক দিয়ে কিনে নিলেন। এর পরিবর্তে ইনস্টিটিউটকে পুরনো বাড়ির লাগোয়া এক টুকরো জমি দেওয়া হল। হর্কহাইমারের অনুরোধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাড়ি তৈরির জন্যে আর পঞ্চান্নহাজার ডয়েসমার্ক দিতে রাজি হলেন। ইনস্টিটিউটের তহবিল থেকেও পঞ্চান্ন হাজার ডয়েসমার্ক পাওয়া গেল। সুতরাং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ইনস্টিটিউটের নিজের বাড়ি তৈরি হয়ে গেল। এতদিন পর্যন্ত ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ তাঁদের ভাঙাচোরা পুরোনো বাড়ির কিছু অংশ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের অফিসের কিছুটা অংশ নিয়ে কাজ চালাচ্ছিলেন।

নতুন বাড়িতে এসে ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে প্রথম যে গবেষণা প্রকল্পটির কাজ হাতে নেওয়া হল সেটা আমেরিকায় শুরু হওয়া প্রভুত্ব এবং পূর্বসংস্কারকেন্দ্রিক গবেষণা প্রকল্পের বিস্তার বলা যেতে পারে। কিন্তু এই প্রকল্পের নতুন অধ্যায়ের যে দিকটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সেটা হল এই যে এই গবেষণার মাধ্যমে তৎকালীন জার্মানীর বিভিন্ন স্তরের মানুষের রাজনীতি সচেতনতার একটা পরিমাপ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। বিশেষ করে যে-জিনিসটার ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল সেটা হল তৎকালীন জার্মানীতে ব্যাপক রাজনীতি-বিমুখতার সামাজিক-তাত্ত্বিক কারণ বিশ্লেষণের চেষ্টার ওপর।

এই প্রসঙ্গে তখনকার জার্মানীর এবং বিশ্বের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের ওপর একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। তখন কোরিয়া-র লড়াই জোর কদমে চলছে। খোদ মার্কিন মুলুকে ম্যাককার্থিজম্ চূড়ান্ত পর্যায়ে। আইসেনহাওয়ার ক্ষমতা হাতে পেয়েই বলছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকায় আনবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কিছু অন্যায় করেনি। জার্মানীতেও তখন কমিউনিস্ট বিদ্বেষ চূড়ান্ত আকার ধারণ করেছে। এর মধ্যেই নবগঠিত জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্র তথাকথিত 'অগণতান্ত্রিক কাজকর্ম ও আন্দোলনে' সরকারী কর্মচারীদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। চ্যান্সেলর আডেনুর ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সুযোগ নিয়ে জার্মানীর পুনরস্ত্রীকরণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে শুরু করলেন। এর প্রতিবাদ করে প্রভাবশালী ক্যাথলিক লেখক ওয়াল্টার কোলব হয়ে গেলেন একঘরে।

কিন্তু এই সব সত্ত্বেও হর্কহাইমারের সামাজিক প্রতিষ্ঠা বাড়ল বই কমলনা। তাই নবগঠিত ইনস্টিটিউটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে সমাজের কেষ্টবিষ্টুরা প্রায় সবাই উপস্থিত হলেন। তারিখটা ছিল ১৪ই নভেম্বর ১৯৫১। এর এক সপ্তাহ পরে রেক্টর হবার পর তাঁর প্রথম ভাষণে হর্কহাইমার আবার ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করলেন। তিনি বললেন বিষয়ভিত্তিক খণ্ডিত গবেষণার আওতা থেকে সমাজ-গবেষণাকে এক যৌথ এবং সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে উন্নীত করতে হবে। আর

এই গবেষণায় ইউরোপীয় দার্শনিক এবং তাত্ত্বিক চিন্তাধারার ঐতিহ্যের সঙ্গে আমেরিকান অভিজ্ঞতাবাদী গবেষণার ধারাকে মেলাবার সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখতে হবে। তিনি আরও বললেন, ...the blinkers must fall away, both those of individual disciplines and those of particular national or school traditions'। কার্ল মার্ক্স ও রোজা লুক্সেমবার্গের উক্তি স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি শ্রোতাদের বললেন, '........the division of labour in bourgeois science should be transcended'। ক্রিটিকাল থিয়োরি কেন প্রয়োজন সেটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বললেন যে, চিকিৎসাশাস্ত্রে যেমন 'হিপোক্র্যাটিক ওথ'-কে চিকিৎসার পূর্বশর্ত হিসেবে গ্রহণ করা হয় তেমনি সমাজ-গবেষণার ক্ষেত্রেও সমাজ পরিবর্তনের প্রতি নিষ্ঠা সমাজবিজ্ঞানীদের ক্ষেত্রে একটা নৈতিক পূর্বশর্ত হওয়া উচিত। সমাজতত্ত্ব এবং সমাজকেন্দ্রিক সমস্ত গবেষণার পেছনে সব সময়েই থাকা উচিত 'an implicit intention to transcend society'।

একাধারে ডীন, রেক্টর আর ইনস্টিটিউটের পুনর্গঠনের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে এই সময়ে হর্কহাইমারের নতুন কোনও লেখা প্রকাশিত হয়নি। তাঁর বিভিন্ন পাঠক্রম এবং বক্তৃতায় 'eclipse of reason' এবং 'dialectics of enlightenment' এর মূলকথাগুলিই ফিরে ফিরে আসছিল। জার্মান পত্রপত্রিকায় অ্যাডোর্নোও যেসব লেখা লিখেছিলেন তাও ছিল প্রধানত সঙ্গীত ও সঙ্গীততত্ত্বের সামাজিক বিশ্লেষণকে কেন্দ্র করে। এই সময়ে তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রসারের পিছনে কী কী সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক কারণ থাকতে পারে তা নিয়েও ভাবতে শুরু করেন। তখনও তিনি মার্কিন নাগরিক এবং আমেরিকায় যে গবেষণাগুলি চলছিল সেগুলির ভারপ্রাপ্ত। তাই তাঁকে বারবার ইউরোপ-আমেরিকা যাতায়াত করতে হচ্ছিল।

এদিকে বাজার সমীক্ষা, জনমত নিয়ে গবেষণা এবং এই ধরনের আরও প্রকল্পগুলির দিকে ইনস্টিটিউট যত আকৃষ্ট হতে লাগল ততই ইনস্টিটিউটের মধ্যেই এই প্রশ্ন উঠতে লাগল যে এইসব প্রশাসনিক সামাজিক গবেষণার অন্ধগলিতে সমীক্ষণী সামাজিক গবেষণা নিজেকে হারিয়ে ফেলছে কিনা। এই প্রসঙ্গে আরও যে-দাবি উঠতে লাগল তা হল এই যে তিরিশের দশকের ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের কিছু কিছু লেখা পুনর্মুদ্রিত হোক, বিশেষ করে 'traditional and critical theory' নামক প্রবন্ধটি। বলা যায় এই সময়ে খুব তীব্র আকারে না হলেও ইনস্টিটিউটের মধ্যে এক 'পরিচিতির সংকট' তথা 'আইডেনটিটি ক্রাইসিস' দেখা দিয়েছিল।

পুনরুত্থান পর্ব

পঞ্চাশের দশকটিকে জার্মানীর পুনর্গঠনের দশক বলা যায়। ১৯৫৩ সালে নবগঠিত জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্রের পার্লামেন্টের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। জার্মানীর অর্থনীতি তখন অনেকটাই স্থিতিশীল হয়েছে। বেকারীত্ব অনেক কমে গেছে, আর সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতাও অনেক বেড়েছে। ধ্বংস হয়ে যাওয়া কলকারখানার অধিকাংশই আবার নতুন করে গড়ে উঠেছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত এবং দ্বিখণ্ডিত পশ্চিম জার্মানী আবার নতুন আশার আলো দেখছে। তবে সবটাই ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির কাঠামোর মধ্যে।

১৯৫৩ সালের আগস্ট মাসেই অ্যাডোর্নো পাকাপাকিভাবে স্বদেশে ফিরে এলেন এবং ১৯৫৫ সালে আবার জার্মান নাগরিকত্ব গ্রহণ করলেন। ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর জন্য দর্শন এবং

সমাজতত্ত্বের এক বিশেষ অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করল, যদিও পুরো অধ্যাপকপদ পেতে তাঁর আরও চার বছর সময় লেগেছিল। ইতিমধ্যে মার্কিউসেরও পত্নীবিয়োগ হলে তিনিও ফ্রাঙ্কফুর্ট ফিরে এসে আবার দর্শন এবং সমাজতত্ত্বের গবেষণায় নিজেকে পুরোপুরি নিয়োগ করতে চাইলেন। হর্কহাইমারও সানন্দে এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। অর্থাৎ ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের তিনজন প্রথম সারির তাত্ত্বিকের আবার একত্রিত হবার সম্ভাবনা দেখা গেল যাঁরা বিভিন্ন সময়ে মিলিতভাবে একটি সামগ্রিক সামাজিক সমীক্ষণী তত্ত্ব সৃষ্টির স্বপ্ন দেখেছিলেন। বাস্তবক্ষেত্রে কিন্তু তা হয় নি। বরং মার্কিউসের সঙ্গে হর্কহাইমারের (এবং অ্যাডোর্নোরও) মানসিক দূরত্ব ক্রমশ বেড়ে গেছে। অ্যাডোর্নো এবং হর্কহাইমার যেমন একদিকে দ্বান্দ্বিক নেতিবাচকতার দিকে ঝুঁকছেন, মার্কিউস হেঁটেছেন তার ঠিক উল্টো পথে। ষাটের দশকে এই বিরোধিতা চরমে ওঠে এবং হর্কহাইমার ইনস্টিটিউটের কাজকর্ম থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন এবং ভিয়েনায় পাকাপাকিভাবে বাস করতে শুরু করেন। বস্তুত ১৯৫৬ সালেই হর্কহাইমার ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর অধ্যাপকপদ থেকে স্বেচ্ছাবসর চেয়েছিলেন। তার কারণ হিসেবে তিনি যেটা দেখিয়েছিলেন সেটা হল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সহকর্মীর তীব্র এবং নিরবচ্ছিন্ন ইহুদিবিদ্বেষ। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবশ্য তখন তাঁকে অবসর গ্রহণ করা থেকে নিরস্ত করতে পেরেছিল।

১৯৫০-এর দশকে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের সঙ্গে স্কুলের প্রথমদিকের তাত্ত্বিকদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনই যুক্ত ছিলেন। তার কারণ এঁদের মধ্যে অনেকেই তখন হয় পরলোকে — যেমন বেঞ্জামিন এবং নয়ম্যান, কিংবা বিদেশে—যেমন কার্শহাইমার। ফ্রোমের সঙ্গে ইনস্টিটিউটের সম্পর্ক তার অনেক আগেই পাকাপাকিভাবে চুকে গিয়েছিল। লোয়েনথলের সঙ্গে পঞ্চাশের দশকেই ইনস্টিটিউটের সম্পর্ক শেষ হয়। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত লোয়েনথল ইনস্টিটিউটের নিউইয়র্কের দপ্তর দেখাশোনা করতেন। তারপর তিনি বার্কলেতে অধ্যাপকের পদে যোগ দেন। ১৯৬০ সালে নিউইয়র্কের দপ্তরটি সরকারীভাবে বন্ধ করা হয়। নতুনদের মধ্যে খুবই প্রতিশ্রুতিমান ছিলেন রাল্‌ফ্ ডারেনডর্ফ। হর্কহাইমার তাঁকে নিজের সহযোগী হিসাবেও চেয়েছিলেন। কিন্তু ডারেনডর্ফ লিখিতভাবেই হর্কহাইমারকে জানিয়ে দেন যে হর্কহাইমারের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটাই আলাদা। পরে তিনি ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ও ছেড়ে যান। এই সবের প্রভাব ইনস্টিটিউটের গবেষণা এবং প্রকাশনার মধ্যেও পড়তে দেখা যায়। সময়টা স্কুলের পক্ষে খুব সুফলপ্রসূ হয়েছিল এমন বলা যায়না। এই সময়কার প্রকাশনার তালিকার মধ্যে আমরা পাই 'Frankfurt Contributions to Sociology-র তিনখণ্ড, যা মূলত আগের লেখার সংকলন, হর্কহাইমারকে উৎসর্গ করা একটি প্রবন্ধ সংকলন 'sociologica', পশ্চিম জার্মানীতে রাজনৈতিক সচেতনতার ওপর গবেষণাপ্রকল্পটির প্রতিবেদন এবং অ্যাডোর্নোর বিভিন্ন সময়ে লেখা প্রবন্ধের একটি সংকলন 'Prisms'। এই সময় ওয়াল্টার বেঞ্জামিনের লেখাগুলিও সম্পাদিত হয়ে দুখণ্ডে প্রকাশিত হয়। তার সঙ্গে আর যেটি প্রকাশিত হয় সেটি হল ম্যানেসম্যান ইণ্ডাস্ট্রিয়াল করপোরেশনে শ্রমিক এবং কাজের পরিবেশ নিয়ে একটি গবেষণার ফলাফল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই ম্যানেসম্যান কর্পোরেশন যেমন যুদ্ধের আগে বলশেভিজম্ বিরোধী গোষ্ঠী এবং নাৎসী পার্টিকে অর্থ সাহায্য করত তেমনি যুদ্ধের সময় জার্মানীর দখলে আসা বিভিন্ন দেশের কলকারখানাও চালাত। এই সময় নাগাদ অ্যাডোর্নোর জার্মান ভাষায় লেখা 'যুক্তির সমাপন' (End of Reason)

নামক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়ে গিয়েছিল কিন্তু বইটি প্রকাশিত হয় কিছুটা পরে। নিঃসন্দেহে বলা যায় এই সময়ের সবচেয়ে সাড়া জাগানো বই ছিল মার্কিউসের 'Eros and Civilization : A Philosophical Inquiry into Freud', যাকে অনেকেই মার্কিউসের Dialectics of Enlightenment বলে অভিহিত করেছিলেন।

আমরা আগেই বলেছি পঞ্চাশের দশকে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের প্রবীন এবং নবীন প্রজন্মের মধ্যে একটা ব্যবধান গড়ে উঠছিল। এর জন্য মূলত দায়ী হর্কহাইমারের রক্ষণশীল এবং প্রতিষ্ঠানবিরোধী চিন্তাধারার বিরোধিতা। তাছাড়া হর্কহাইমার এই সময়ে ক্রমশ এক নেতিবাচক চিন্তাধারায় আচ্ছন্ন হতে থাকেন। আলোকপ্রাপ্তির আত্মহননের পথ থেকে নিষ্কৃতির কোনও রাস্তা আর তাঁর চোখে পড়ছিলনা। যে-চিন্তাধারা পরে অ্যাডোর্নোর 'নেতিবাচক দ্বান্দ্বিকতা' নামক পুস্তকে পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়, এবং যার জন্যে হাবারমাস এই দুজনকে উত্তরাধুনিকদের সঙ্গে একাসনে বসিয়ে তীব্র আক্রমণ করেন। ভাবতে আশ্চর্য লাগে হর্কহাইমার পঞ্চাশের দশকে আলজিরিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধ সমর্থন করেন নি। ভিয়েতনামে মার্কিন আগ্রাসনের সরাসরি নিন্দা থেকেও তিনি নিজেকে বিরত রাখেন।

অ্যাডোর্নোর রাজনৈতিক অবস্থান অবশ্য অনেকটাই হর্কহাইমারের থেকে আলাদা ছিল। আমরা দেখি ১৯৫৯ সালের এক বক্তৃতায় অ্যাডোর্নো বলছেন, 'I regard the survival of Nazism within democracy as potentially more threatening than the survival of fascist tendencies against democracy'। তাঁর আরও মনে হয়েছিল সত্য তো বটেই এমনকি নীতিবোধও ক্রমশ ভাবাদর্শের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে (Along with truth morality too was being turned into ideology)। এই সময়টা আরও এক কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সময় নাগাদ হফ্স্টাটার এবং অ্যাডোর্নোর মধ্যে বিজ্ঞানের দর্শন এবং বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতি নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে, যেটা দৃষ্টবাদী বিতর্ক নামে পরিচিত। এই বিতর্কে ক্রমশ অনেকেই জড়িয়ে পড়েন এবং বিতর্কও অনেক দিন ধরে চলে।

অ্যাডোর্নো ফ্রাঙ্কফুর্ট ফিরে আসার পর তাঁর সঙ্গীত এবং নন্দনতত্ত্বের ওপর লেখাটাই যে শুধু বিশেষভাবে আদৃত হয়েছিল তাই নয় তাঁর কয়েকটি কম্পোজিসনও খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে যেদুটি বইয়ের কথা উল্লেখ করা উচিত সেদুটি হল 'Philosphy of Modern Music' এবং 'Dissonances' । তরুণ ছাত্রমহলে তখন অ্যাডোর্নোর সমূহ প্রভাব। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি অস্কার নেগ্‌ট আইনশাস্ত্রের পাঠ মাঝপথে বন্ধ করে অ্যাডোর্নোর কাছে দর্শন পড়তে এলেন। হাবারমাসও পরে বলেছেন যে অ্যাডোর্নোর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল এক চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা। অ্যাডোর্নো তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে হেগেলের ওপর সেমিনার দিতেন এবং সাংস্কৃতিক জীবনের অবক্ষয়ের ওপর লিখতেন। কিন্তু তাঁর লেখায় যে ক্রিটিকাল থিওরির পূর্ণাঙ্গ কোনও রূপের আদল ফুটে উঠত হাবারমাস এমনটা মনে করতে পারেননি।

ষাটের দশকের গোড়ায় সাহিত্যে এবং বিশেষ করে নাটকে যে নতুন আন্দোলনের ঢেউ উঠেছিল অ্যাডোর্নো ছিলেন তার প্রবল সমর্থক। স্যামুয়েল বেকেটের 'Endgame' দেখার পরে হর্কহাইমারকে লেখা এক চিঠিতে তিনি ঐ নাটকের শুধু উচ্ছ্বসিত প্রশংসাই করলেন না, তার সঙ্গে একথাও বললেন যে, আমরা যে-কথাগুলো বারবার বলার চেষ্টা করছি, আধুনিক সমাজের কাছে

অত্যন্ত অস্বস্তিপূর্ণ সেই সব কথাই নাট্যকার তাঁর নাটকে অত্যন্ত সাবলীলভাবে বলেছেন। 'Waiting for Godot' সম্পর্কেও তিনি একই ধরনের কথা বলেন। বলা বাহুল্য, অ্যাডোর্নোর এইসব সমালোচনা প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য-নাট্য-সঙ্গীত সমালোচকদের কাছে খুব সুপাচ্য ছিল না, কিন্তু তরুণ প্রজন্ম তাঁকে মাথায় তুলে নিয়েছিল। ১৯৬৬ সালে 'Negative Dialectics' প্রকাশিত হয়। তার আগে কিয়েের্কেগার্ড আর হুসার্লের ওপর তাঁর আরও দুটি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল। 'নেগেটিভ ডায়ালেকটিকসে'র মাধ্যমে অ্যাডোর্নো যা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তা হল সমকালীন সমাজ ও জীবনের অলীক এবং নিষ্ঠুর চেহারার এক পূর্ণাঙ্গ প্রতিচ্ছবি। কিন্তু তারপরেও যে-প্রশ্নটা থেকে যায় এবং হাবারমাস যে প্রশ্নটা বারবার তুলে ধরতে চেয়েছেন সেটা হল এই যে, এখানেই এই সর্বগ্রাসী নেতির মধ্যেই কি ক্রিটিকাল থিয়োরির শেষ, নাকি উত্তরণের পথ খোঁজাও তার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

আমরা আগেই বলেছি পঞ্চাশের দশকে ইনস্টিটিউট শিল্পভিত্তিক সমাজতত্ত্বের ওপর কয়েকটি গবেষণা প্রকল্প হাতে নিয়েছিল। সেই সূত্রে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত হয়েছিলেন তাঁরা হলেন লুডভিগ ফন ফ্রাইডেবার্গ এবং রালফ ডারেনডর্ফ। এঁদের মধ্যে ডারেনডর্ফ অল্প দিনের মধ্যেই ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে চলে যান। ফ্রাইডেবার্গ অবশ্য থেকে যান। আর যিনি অ্যাডোর্নোর সহকারী হিসাবে ইনস্টিটিউটে যোগ দেন তিনি হলেন যুর্গেন হাবারমাস। বিশেষ প্রতিভাবান হওয়া সত্ত্বেও মূলত দর্শনের এই ছাত্র কখনই হর্কহাইমারের সুনজরে আসেননি। কারণ মার্কিউসের মতো তরুণ মার্ক্স এবং লুকাচের লেখার সঙ্গে তিনিও হাইডেগারের লেখারও মনোযোগী পাঠক ছিলেন। তাছাড়া হর্কহাইমাররা মনে করতেন এই 'ছোকরা' ঘোরতর রকমের বামপন্থী। কিন্তু গোড়া থেকেই হাবারমাস এবং মার্কিউসের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

নতুন যুগ

ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যুক্ত হবার সময় থেকেই হাবারমাসের মনে হয়েছিল যে, যে-উদ্দেশ্য নিয়ে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের উদ্ভব সেই কাজটাই তখনও অপূর্ণ রয়ে গেছে। সেটা হল বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার একটা পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষণ। তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল যে এই ধরনের সামগ্রিক তত্ত্বের মূল অনুপ্রেরণা যেখান থেকে আসতে পারে সেটা হল মার্ক্সীয় ঐতিহ্যের সূত্র ধরে উঠে আসা 'a utopian perspective of a radical critique of dominant conditions'। তাঁর বহুধাবিস্তৃত রচনাবলীর মাধ্যমে হাবারমাস সারা জীবন ধরে সেই চেষ্টাই করে চলেছেন। প্রথাগত মার্ক্সবাদ থেকে তাঁর চিন্তাধারা অনেকটা দূরে সরে গেলেও তিনি বরাবর মূলত মার্ক্সবাদী বলেই নিজের পরিচয় দিয়েছেন।

হাবারমাসের প্রথম দিকের দুটি প্রধান লেখা হল 'Students and Politics : A Sociological inquiry into the political awareness of Frankfurt Students' এবং 'Structural Transformation of the Public Sphere'। এই দুটির প্রথমটিতে হাবারমাসের সহকর্মী ছিলেন ক্রিস্টোফার ওলার এবং ফ্রিডরিশ ভেল্টজ। মূলত অভিজ্ঞতাবাদী এই কাজটির মুখবন্ধের তাত্ত্বিক লেখাটি হাবারমাসের। এখানে হাবারমাস বলছেন যে, তাঁদের গবেষণার মাধ্যমে তাঁরা যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা হল এই যে আধুনিক-যুগে আমরা যেমন একদিকে পাই

একটা সত্যিকারের রাজনৈতিক সমাজ তেমনি অন্যদিকে পাই অসংখ্য অরাজনৈতিক নাগরিক। এখানে হাবারমাস সত্যিকারের রাজনীতি-অভিমুখীকরণ এবং কৌশলগত অভিমুখীকরণের মধ্যে একটা প্রভেদ করছেন। তিনি বলছেন, 'Contemporary period was at a crossroad between an authoritarian welfare state and substantive democracy'। রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রচলিত সংজ্ঞা থেকে অনেকটা সরে গিয়ে হাবারমাস বলছেন, 'The idea of democracy – that legitimate state power is mediated by free and express consensus of all citizens–lay at the roots of bourgeois constitutional democracy'। এবং সেক্ষেত্রে 'Participation could only go beyond being a mere value in itself if democracy was seen as a historical process aimed at creating a society of responsible citizens and transforming social power into rational authority. Political participation therefore ran parallel to contributing to the creation of conditions in which all citizens did in fact participate, and in which the general regulation of the reproduction of social existence excluded economic inequality, as a source of unequal opportunities to participate in politics.'

দ্বিতীয় গ্রন্থটিতে হাবারমাস মধ্যযুগের ক্রান্তিকালীন সময়ে ইউরোপে কীভাবে একটি শক্তিশালী পরাব্যক্তিক ক্ষেত্রের তথা পাবলিক স্ফিয়ারের উদ্ভব হল এবং ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিবর্তনের ফলে তা কীভাবে ক্রমশ সঙ্কুচিত হ'তে থাকল তার রূপরেখা বর্ণনা করেছেন। হাবারমাসের মতে এই পরাব্যক্তিক স্তরেই আমাদের বাস্তব জীবনের নৈতিকতার প্রশ্নটি ক্রমাগত আলোচিত হয়ে এক নীতিবোধে পরিণত হয় যা সমাজজীবনকে ধরে রাখে। কিন্তু বর্তমান সমাজে সেই অত্যন্ত মূল্যবান পরাব্যক্তিক জগৎটি প্রচার মাধ্যমের মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত হয়ে তার স্বকীয়তা হারাতে বসেছে। দার্শনিক জীবনের প্রথম দিকের এই উপলব্ধি হাবারমাসকে ক্রমশ অবদমিত সংযোগ এবং পরস্পর-নির্ভর সংযোগী ক্রিয়ার তত্ত্বের দিকে নিয়ে গেছে, যেখানে তিনি আলোকপ্রাপ্তির আত্মহননের ব্যাপক আয়োজন এবং যুক্তির যুগের ক্রমব্যাপ্ত যুক্তিহীনতা থেকে উত্তরণের এক অলোক-বর্তিকার সন্ধান পেয়েছেন। তিনি মনে করেন, 'As speaking subjects we always find ourselves in a form of communication which is intended to lead to agreement and thus to comprehensive rationality.'

এখানে আরও একটা জিনিস উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথম পুস্তকটিতে হাবারমাস রাজনীতির প্রতি ঝোঁকের ওপর নির্ভর ক'রে নাগরিকদের পাঁচভাগে ভাগ করেছেন—যাঁরা সাধারণত অরাজনৈতিক এবং কোনও যুক্তি ছাড়াই রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে চান, যাঁরা সঙ্গত কারণেই রাজনীতি থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছেন, যাঁরা বিচার-বিবেচনা-হীন, যাঁরা ভাবনা-চিন্তা করেন এবং যাঁরা রাজনীতির প্রতি নিষ্ঠাবান। একই সঙ্গে রাজনৈতিক প্রবণতাকে ভিত্তি ক'রে তিনি নাগরিকদের চারভাগে ভাগ করেছেন — যাঁরা মনেপ্রাণে গণতান্ত্রিক, যাঁরা পোষাকী গণতান্ত্রিক, যাঁরা প্রভুত্ববাদী এবং যাঁরা উদাসীন। আশ্চর্যের বিষয় হাবারমাসের এই মূল্যবান ভূমিকা ইনস্টিটিউটের সরকারী প্রকাশনা তালিকায় রাখা হয়নি, যেমন রাখা হয়নি বেঞ্জামিনের বিখ্যাত লেখা 'The work of Art in the Age of Mechanical Reproduction'।

হাবারমাসের দ্বিতীয় গ্রন্থও প্রকাশ করা সম্ভব হয় German Research Foundation-এর অর্থানুকূল্যে।

ষাটের দশকে হাবারমাস এবং ফ্রিডবার্গ দুজনকেই ইনস্টিটিউট ছাড়তে হয়। পরে অবশ্য দুজনেই আবার ফ্রাঙ্কফুর্ট ফিরে আসেন। এই সময়ে ইনস্টিটিউটে আর যেসব গবেষক ছিলেন তাঁদের প্রকাশনার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আলফ্রেড স্মীড-এর 'The concept of Nature in Marx's theory' এবং অস্কার নেগ্ট্-এর 'Structural Relationship between Comte's and Hegel's Theories of Society'।

পঞ্চাশের দশক থেকেই ইউরোপে প্রত্যক্ষবাদ নিয়ে যে বিতর্ক চলছিল ষাটের দশকে হাবারমাসও তাতে অংশগ্রহণ করেন। হাবারমাসের মতে তিন ধরনের উদ্দেশ্য থেকে তিন ধরনের জ্ঞানস্পৃহার সৃষ্টি হয়, যার থেকে তিন ধরনের বিজ্ঞানের সম্ভাবনার কথা ভাবা যেতে পারে। এগুলি হল—অভিজ্ঞতাবাদী এবং বিশ্লেষণভিত্তিক বিজ্ঞান, ঐতিহাসিক এবং তাৎপর্যনির্ণায়ক বিজ্ঞান এবং সমীক্ষণী বিজ্ঞান। এই তিন ধরনের বিজ্ঞানের পেছনে তিন ধরনের যুক্তিবাদ কাজ করে। প্রথমটির লক্ষ্য প্রকৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তার, দ্বিতীয়টি ব্যবহারিক এবং আচরণভিত্তিক, আর তৃতীয়টি থেকে আসে মানবমুক্তির অনুপ্রেরণা। হাবারমাস মনে করেন প্রকৃতি জগৎ থেকে মানুষের উত্তরণের অন্যতম মূল হাতিয়ার হ'ল ভাষা। মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগ প্রচেষ্টার মাধ্যমে যে-ভাষা গড়ে ওঠে তার মধ্যেই মানবমুক্তির ভাবনা সুপ্ত হয়ে থাকে। ভাষার মধ্যে এক ধরনের যুক্তিশৃঙ্খলা দেখা যায়, যেটা একথাই প্রমাণ করে যে ভাষাব্যবহারকারী সমস্ত মানুষের মধ্যেই একটা যুক্তিবাদী প্রেরণা কাজ করে। এই যুক্তিবাদিতাই মানবমুক্তির ইচ্ছার মূল। কিন্তু এই প্রেরণাই বারবার ব্যক্তিগত এবং সামাজিক অবদমনের শিকার হয়ে ভাবাদর্শের কুহেলিকায় নিজের পথ হারিয়ে ফেলে। সমীক্ষণী তত্ত্বের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এই মোহ আবরণের পেছনে লুকিয়ে থাকা সত্যের উদ্‌ঘাটন। যে মুক্ত সমাজ সৃষ্টি তাদের লক্ষ্য তার একটা আভাসও হাবারমাস দিচ্ছেন—'In an emancipated society domination would be dismantled, social relations between individuals would consist of a non-authoritarian universally practised dialogue.'

উত্তাল ষাটের দশক

সমস্ত পশ্চিম ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকায় পঞ্চাশের দশকটা ছিল রক্ষণশীলতা এবং প্রতিক্রিয়াশীলতার দশক। এর মূলে ছিল সোভিয়েট বিরোধিতা এবং সাম্যবাদ বিদ্বেষ। আমেরিকার নেতৃত্বে চলছিল পৃথিবী জুড়ে সমরসজ্জা এবং সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় সন্ত্রাস, তথাকথিত মুক্ত দুনিয়ায় ধনতন্ত্রকে শক্ত বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস এবং তৃতীয় বিশ্বে প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা। ষাটের দশকের গোড়ার দিকেও এই রক্ষণশীলতা ছিল অপ্রতিহত। ফ্রাঙ্কফুর্টের পুরোনো নেতৃত্বের মধ্যে এর কোনও বিরোধিতার চিহ্ন দেখা যায়নি। বরং হর্কহাইমার, পোলক প্রতিষ্ঠান-পন্থীদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলাটাই শ্রেয় বলে মনে করেছিলেন। ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত অ্যাডোর্নোর Negative Dialectics-এও আমরা শুধু যে সমীক্ষণীতত্ত্বের অভাব দেখি তাই নয়, এর মধ্যে তখনকার সামাজিক-রাজনৈতিক টানাপোড়েনের কোনও প্রতিচ্ছবিও দেখিনা। এক মূলোচ্ছিন্ন তাত্ত্বিকতার দুরূহ আবরণে এই প্রায়-দুর্ভেদ্য গ্রন্থটি আচ্ছন্ন।

কিন্তু ষাটের দশকের মাঝামাঝি সমস্ত পশ্চিমী দুনিয়া, বিশেষ করে ছাত্রসমাজ এই অসহিষ্ণু, যুদ্ধবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল এবং শোষণকারী জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে উত্তাল হয়ে ওঠে। তার সঙ্গে যোগ হয় তৃতীয় বিশ্বে উপনিবেশবাদ এবং নয়া-উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন। আমেরিকায় এই বিক্ষোভের কেন্দ্রে ছিল ভিয়েতনাম-যুদ্ধের বিরোধিতা। তাতে ইন্ধন যোগালো পৌর অধিকার রক্ষার লড়াই আর কালো মানুষদের সমাজের মূলস্রোতে নিয়ে আসার জন্য আন্দোলন, ম্যাক-কার্থিসিজম-এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ এবং গণতন্ত্র রক্ষার লড়াই। ক্যালিফোর্নিয়ায় বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ক্যাম্পাসে ধর্ণা শুরু করলে শুধু ওখানেই চারশ ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হল। তারপর শুরু হল একটার পর একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ, জমায়েত এবং প্রতিবাদ আন্দোলন। শুরু হল শান্তি পদযাত্রা। এই শান্তি আন্দোলন নতুন মাত্রা পেল সমস্ত পৃথিবীব্যাপী পারমানবিক অস্ত্রসম্ভার উৎপাদন এবং পারমানবিক অস্ত্রসজ্জার বিরুদ্ধে আন্দোলনের মধ্যে। দাবি উঠল নিরস্ত্রীকরণের। শান্তি আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে নিজেদের যুক্ত করলেন বার্ট্রান্ড রাসেল এবং জাঁ পল সার্ত্রের মতো দার্শনিকেরা। এর সুগভীর প্রভাব পশ্চিম জার্মানীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ওপরও পড়ল। দ্বিধা-বিভক্ত জার্মানী তখন ঠাণ্ডা লড়াইয়ের প্রথম সারির সমরাঙ্গন।

ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের নতুন প্রজন্ম এই আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের আত্মিক যোগের কথা সোচ্চারে ঘোষণা করলেন। সেই সঙ্গে হর্কহাইমার, পোলক এবং অ্যাডোর্নোর নেতৃত্বের দিনও শেষ হল। ১৯৬৪ সালে মার্কিউসের 'One Dimensional Man; Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society' প্রকাশিত হল। এই গ্রন্থ একাধারে সাম্রাজ্যবাদ এবং প্রাগ্রসর শিল্প-নির্ভর ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার এক তীক্ষ্ণ সমালোচনা। ১৯৬৬ সালে ফ্রানজ ফ্যাননের 'The wretched of the Earth' এবং মার্কিউসের 'Repressive Tolerance' জার্মানীতে প্রকাশিত হয়। প্রথম বইটি ১৯৬১ সালে যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন সার্ত্র এই পুস্তকের সঙ্গে তাঁর গভীর সহমর্মিতার কথা জানান। এখন মার্কিউসও তাঁর সঙ্গে গলা মেলালেন। এই প্রথম ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের কোনও লেখক তৃতীয় বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে তাঁদের নৈতিক একাত্মতার কথা ঘোষণা করলেন। মার্কিউস ফ্যাননের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বললেন বিপ্লবী বলপ্রয়োগ এবং প্রতিক্রিয়াশীল বলপ্রয়োগের মধ্যে এক মূলগত প্রভেদ রয়েছে। 'In terms of ethics both forms of violence are inhuman and evil – but since when history is made in accordance with ethical standard....'. শুধু শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রামের মধ্যেই নয়, তৃতীয় বিশ্বের প্রান্তবাসী মানুষদের সংগ্রামের মধ্যেও যেমন চে গুয়েভারা দেখেছিলেন, মার্কিউসের লেখায় আমরা তারও প্রতিধ্বনি পাই। তিনি আরও লিখলেন, 'I believe there is natural right of resistance for oppressed and overpowered minorities to use extralegal means if the legal ones have proved to be inadequate..... If they use violence, they do not start a new chain of violence but try to break an established one'। আর এই ধরনের বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হয় কারণ, 'Law and order are always and everywhere the law and order which protect the established order'।

এই ১৯৬৬ সালেরই ২২শে মে ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠানবিরোধী জার্মান ছাত্র সংস্থা 'জার্মান সোশ্যালিস্ট স্টুডেন্টস্ লীগ'-এর আহ্বানে এক সম্মেলন হয় যাতে অনেক অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী এবং শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধিরাও যোগ দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন ফ্রায়ডেবার্গ যিনি তখন শুধুই ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকই নয় ইনস্টিটিউটেরও পরিচালক। এই সম্মেলনে হাবারমাস এবং নেগ্‌ট্ বিশেষ ভূমিকা নেন। সম্মেলনের মূল ভাষণটি দিয়েছিলেন মার্কিউস। তিনি বলেন , ভিয়েতনামে যা ঘটছে সব রকম ভাবেই তার প্রতিবাদ হওয়া প্রয়োজন। সে প্রতিবাদ যতই অপ্রতুল ও অসহায়-ই মনে হোক না কেন। এর এক বছর পরে, জুলাই ১৯৬৭ সালে, আমরা দেখি মার্কিউস বার্লিনে নতুন বামপন্থীদের একজন মুখ্য প্রবক্তা হিসাবে আদৃত হচ্ছেন। বার্লিনের ফ্রী ইউনিভার্সিটি তখন বিপ্লবী ছাত্র-আন্দোলনের মূল কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ও তার প্রথম সারির অনুসরণকারী।

ছাত্র আন্দোলনের প্রথম দিকে হাবারমাস, নেগ্‌ট্ বা মার্কিউস এই আন্দোলনের মধ্যে স্ববিরোধ, একদেশদর্শিতা, অসহিষ্ণুতা এবং অনেক সময় অকারণ উচ্ছৃঙ্খলতা সমর্থন না করলেও তার বিরোধিতা করেননি। সর্ব অর্থেই এটা ছিল মূর্তি ভাঙার সময়। কিন্তু ছাত্র আন্দোলন যত উচ্ছৃঙ্খল হতে লাগল তত ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের সঙ্গে ছাত্র নেতাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটতে লাগল। এমনকি এক সময় অ্যাডোর্নোর অত্যন্ত জনপ্রিয় দর্শন শাস্ত্রের ক্লাশও ছেলেরা জোর করে বন্ধ করে দিল। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের সমর্থকরা তখন প্রকাশ্যেই ছাত্র আন্দোলনের এই ধারার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেন, যার ফলে সম্পর্ক তিক্ততার চরমে পৌঁছোল। তাঁরা বললেন ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে ক্রমশ এক বাম-ফ্যাসিবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। এর বিরুদ্ধে তাঁরা সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন। তাঁরা স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, গণতন্ত্র-বিরোধী যে ফ্যাসিবাদ আমরা দেখেছি তার চেয়ে গণতন্ত্রের নামে যে ফ্যাসিবাদ প্রচলন করা হয়, কিংবা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে যে-ফ্যাসিবাদ বাসা বাঁধে তা আরও ক্ষতিকর। কারণ, প্রথম ক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদকে ফ্যাসিবাদ বলে চিনতে অসুবিধে হয় না। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রের প্রচ্ছন্ন ফ্যাসিবাদ গণতন্ত্রের মূল কাণ্ডেই ঘুন ধরায়, তার নৈতিকতার ভিত্তিকে নষ্ট করে দেয়। এই সময় থেকেই জার্মানীর প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে ক্রিটিকাল স্কুলের সম্পর্ক শিথিল হতে থাকে। পরে তা পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু ষাটের দশকের পৃথিবীব্যাপী প্রতিবাদ আন্দোলনের দিনগুলি বামপন্থী চিন্তাজগতে এক প্রত্যক্ষ এবং স্থায়ী প্রভাব রেখে যায়, যার পিছনে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের অবদান অস্বীকার করা যায়না।

১৯৬৮ সালে অ্যাডোর্নো যখন তাঁর নন্দনশাস্ত্রের বই নিয়ে ব্যস্ত তখন হাবারমাসের দুখানি বই প্রকাশ পেল—'Knowledge and Human Interest' এবং 'Technology and Science as Ideology'। ১৯৭১ সালে প্রকাশিত হয়, 'Philosophical and Political Profiles', ১৯৭৩-এ 'Culture and Critique' আর ১৯৭৬-এ 'The Reconstruction of Historical Materialism'। মোটামুটি এই সময় নাগাদ হাবারমাস ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল এবং ক্রিটিকাল থিয়োরির মূল প্রবক্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। ক্রিটিকাল থিয়োরির যে পূর্ণাবয়ব মূর্তির কথা হর্কহাইমাররা ভেবেছিলেন, তর্কসাপেক্ষে হাবারমাসের হাতেই তা বাস্তব রূপ পেল। মনে হয় হাবারমাসই ছিলেন এর জন্যে সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি। মূলত দর্শনের ছাত্র হলেও হাবারমাস

মনস্তত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানেও স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেছেন। ক্রিটিকাল থিয়োরির প্রবক্তারাও চেয়েছিলেন যে দর্শনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠলেও মানববিদ্যার সব শাখাই ক্রিটিকাল থিয়োরির মধ্যে প্রতিফলিত হবে।

১৯৭০ সালের গোড়াতেই এটা বোঝা যাচ্ছিল যে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল আর জার্মানীর প্রতিষ্ঠানবিরোধী আন্দোলনের তাত্ত্বিক পথপ্রদর্শক হিসাবে কাজ করছেনা। প্রতিবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যাঁরা সংযুক্ত ছিলেন তাঁদের অনেকেই লেনিনবাদ, স্টালিনবাদ বা মাওবাদ থেকে তাঁদের অনুপ্রেরণা আহরণ করছিলেন। সেই সুযোগে ১৯৭২ সালে ফেডারেল রিপাবলিক এবং অনেকগুলি রাজ্য সরকার শিক্ষক এবং সরকারী কর্মচারীদের কোনও ধরনের প্রতিবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার অধিকারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করল। সরকারী চাকরির ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক বাছবিচার শুরু হল। তখন ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল পশ্চিম জার্মানীতে একটি অতি পরিচিত নাম। তার সঙ্গে যে-কোনও ধরনের সংস্রবই সরকারী ভ্রূকুটির কারণ হয়ে দাঁড়াল। পশ্চিম জার্মানীতে কয়েকজন পরিচিত রাজনৈতিক নেতা এবং সরকারী পদাধিকারীর নিধন এই প্রবণতায় ঘৃতাহুতি দিল। বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম সেই সুযোগে বলতে শুরু করল যে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলই হল সমস্ত ধরনের সন্ত্রাসের উৎপত্তিস্থল। সেই সঙ্গে সাধারণভাবে সমস্ত ধরনের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু হল। রক্ষণশীলরা ভাবতে শুরু করলেন ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের অন্তিমকাল আসন্ন। তার ভবিষ্যত অন্ধকার। গুন্থার রয়মুনসার ১৯৭০ সালে একটা বইই লিখে ফেললেন যার নাম 'The Poverty of Critical Theory', যেখানে হর্কহাইমার, অ্যাডোর্নো এবং মার্কিউসকে একই পংক্তিতে বসিয়ে তিনি রায় দিলেন পশ্চিম জার্মানিতে সন্ত্রাসবাদের জনক হলেন তাঁরাই। ১৯৭২ সালে টপিট্স এঁদের সঙ্গে হাবারমাসকেও জড়িয়ে ফেলে বললেন যে তাঁর 'dialogue free of domination'-এর তত্ত্ব নাৎসীবাদের চেয়েও ক্ষতিকর। একই ধরনের চিন্তার প্রতিধ্বনি মিলল ১৯৭৮ সালে লেখা হেনিং গুন্থারের বই 'The Violence of Negation : Critical Theory and Its Cosequence' গ্রন্থে।

কিন্তু এই প্রচণ্ড বিরোধিতার বাতাবরনেও হাবারমাস, নেগ্ট, ওয়েলম্যান, ক্লস অফ্ এবং অ্যালব্রেখট্ ওয়েলমার ক্রিটিকাল থিয়োরির প্রতি তাঁদের অবিচল আস্থার কথা বারবার ঘোষণা করলেন তাঁদের লেখায় এবং বক্তৃতায়। তাঁদের বিশ্বাস এবং সৃজনশীলতার একটা সামাজিক স্বীকৃতি মিলল যখন ফ্রাঙ্কফুর্টের মেয়র হাবারমাসকে অ্যাডোর্নো স্মৃতি পুরস্কার দিলেন। এটাকে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের দ্বিতীয় প্রজন্মের চিন্তাবিদ্‌দের স্বীকৃতি হিসাবে ধরা যেতে পারে। হর্কহাইমার, পোলক, লোয়েনথল এবং অ্যাডোর্নোকে যদি ইনস্টিটিউট অব্ সোশ্যাল রিসার্চের প্রথম পর্বের নায়ক হিসাবে দেখা যায় তাহলে হাবারমাসের সঙ্গে আর্নস্ট ব্লক, গুন্থার অ্যান্ড্রিরাস এবং উলরিখ সোনেম্যানকে এই স্কুলের দ্বিতীয় পর্বের নায়কদের মধ্যে ফেলা উচিত। এই দুই পর্ব মিলিয়ে ক্রিটিকাল থিয়োরির ইতিহাস—যা অনেক সময় পশ্চিমী মার্ক্সবাদ বা নব্য-মার্ক্সবাদ পরিচিতিতে এবং মার্ক্সবাদের চিরকালীন মার্ক্সীয় ঐতিহ্যে সব ধরনের প্রভুত্বের অবসানের সঠিক পথ অন্বেষণের জন্য প্রয়াসী; যে-পথ আলোকপ্রাপ্তির যুগের প্রতিশ্রুতিকে ধনতান্ত্রিক আধুনিকতার কানাগলি থেকে উদ্ধার করে এক উদার মানবমুক্তির সম্ভাব্য কল্পরাজ্যে নিয়ে যাবার পথ দেখাবে। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল এবং তাঁর অনুগামীরা এখনও সেই পথের সন্ধানী পথিক।

প্রস্তাবনা

আমরা দেখেছি যে ভাইমার প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্ক্সবাদ চর্চার প্রথম কেন্দ্র হিসাবে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের শুরু। কিন্তু তত্ত্বগত দিক থেকে প্রাতিষ্ঠানিক মার্ক্সবাদের সঙ্গে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের কখনও প্রচ্ছন্ন কখনও স্পষ্ট একটা টানাপোড়েনের চিহ্ন ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের ইতিহাসের প্রায় সর্বস্তরেই লক্ষ করা যায়। তিরিশের দশকে হর্কহাইমারের লেখা থেকে বর্তমান কালে হাবারমাসের লেখার মধ্যে তার প্রমাণ মেলে। মার্ক্সবাদের যে ধারণাগুলিকে সাধারণত মার্ক্সবাদের মূল সূত্র হিসাবে গ্রহণ করা হয় ফ্রাঙ্কফুর্ট তাত্ত্বিকেরা তার অনেকগুলিই স্বীকার করেননা। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে গত শতাব্দীর যাটের দশকে পশ্চিম ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকায় মার্ক্সবাদ চর্চার যে পুনরোভ্যুত্থান হয় তাতে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের অবদান বিশাল।

মার্ক্সবাদের মূল স্রোতের সঙ্গে মিল গরমিলের পাশপাশি ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল সম্পর্কে আর একটা কথাও মনে রাখা প্রয়োজন। সেটা হল তাঁদের লেখায় ম্যাক্স ওয়েবারের প্রভাব। তাঁর শেষ দিকের লেখায় ম্যাক্স ওয়েবার আধুনিক জীবনে যৌক্তিকিকরণের ক্রমবর্ধমান প্রভাব লক্ষ করে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছিলেন। বুর্জোয়া সমাজ এবং বিশেষ করে তার সংস্কৃতির অবক্ষয়ের কারণ এবং প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের চিন্তানায়কদের অনেকেই ম্যাক্স ওয়েবারের এই যৌক্তিকিকরণের তত্ত্ব ব্যবহার করেছেন। কট্টর মার্ক্সবাদীরা অবশ্য মার্কস এবং ম্যাক্স ওয়েবারকে এইভাবে মেলানোর চেষ্টাকে মোটেই ভাল চোখে দেখেন নি। কিন্তু আপাতত আমরা সে-আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করবনা।

ধনতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান প্রসারের মধ্যে জার্মানীতে ইহুদিবিদ্বেষ এবং নাৎসীবাদের উদ্ভবের তমসাচ্ছন্ন সময়ে জার্মানীর সমাজমানসে তাঁরা যে-দেউলিয়াভাব লক্ষ করেছিলেন, এবং যার প্রত্যক্ষ শিকার হয়েছিল ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল নিজেই, সমাজমনের কোন গভীরে তার জন্ম এবং সমাজব্যবস্থার কোন অবস্থায় তার বিস্তার নিঃসন্দেহে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের চিন্তাভাবনার এক বিরাট অংশ জুড়ে ছিল এই দুটি বিষয়। বস্তুত সেই কারণে সামাজিক মনের গভীরে একদিকে বিদ্বেষ এবং অন্যদিকে কর্তৃত্ব কীভাবে কাজ করে তা বোঝার জন্য তাঁরা মনস্তত্ত্ব বিশেষ করে ফ্রয়েডীয় মানোবিশ্লেষণের সাহায্য নিয়েছিলেন। আলোকপ্রাপ্তি এবং যুক্তির যুগের হাত ধরে উঠে আসা ধনতন্ত্রের 'উন্নত পর্যায়ে' সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক জগতে যুক্তিহীনতার ক্রমবর্ধমান প্রসার ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের চিন্তানায়কদের মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। সমাজদর্শন এবং সমাজবিজ্ঞানের চর্চাকে তাঁরা সব সময়েই সমাজ-উত্তরণের হাতিয়ার বলে মনে করেন। তাই সমাজবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রকৃতিবিজ্ঞান এবং প্রত্যক্ষবাদের পদ্ধতিগুলির অন্ধ প্রয়োগ তাঁদের উত্তেজিত বিরোধিতার কারণ হয়েছিল।

ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের প্রতিষ্ঠার পরবর্তী দু'তিন দশকে জার্মানী বা জার্মানীর বাইরে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের চিন্তাধারার তেমন কোনও প্রভাব পড়েনি। এর কারণগুলি বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। তিরিশের দশক থেকে পরবর্তী দশকগুলির ছিল এমন একটা সময় যখন জার্মানীর

সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক জীবনের দ্রুত পট পরিবর্তন হচ্ছিল। সমাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের উত্থান পতন, অর্থনৈতিক মন্দা, হিটলার এবং নাৎসীবাদের অভ্যুত্থান এবং জার্মানীর সঙ্গে বহির্জগতের ক্রমবর্দ্ধমান বিচ্ছিন্নতা ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের চিন্তাধারার বিস্তারে মোটেই সাহায্য করে নি। তাছাড়া ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের লেখকরাও লিখতেন জার্মান পাঠকের কথা মাথায় রেখে মূলত জার্মান ভাষায়। দর্শনাশ্রয়ী তাঁদের লেখা নতুন গড়ে ওঠা সমাজবিজ্ঞানের দরবারে তখন মোটেই প্রভাব বিস্তার করেনি। তাছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন দেশের সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে যোগাযোগও ছিল আজকের তুলনায় নিতান্তই কম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল যখন আমেরিকার প্রবাসজীবন যাপন করছিল তখনও তাঁদের তাত্ত্বিক লেখা ওখানকার অধ্যাপক-গবেষণার মধ্যে বিশেষ পরিচিত ছিলনা। বস্তুত পঞ্চাশের দশকের আগে ম্যাক্স ওয়েবারের লেখাও ইংরেজিতে অনুবাদ হয় নি। হাবারমাসের লেখাও অনূদিত হতে থাকে ষাটের দশকের শেষের দিকে।

বস্তুত ষাটের দশকটা ছিল সারা বিশ্বে চিন্তাজগতের ক্ষেত্রে একটা বিরাট মোড় ফেরার সময়। ঐ সময়ে পশ্চিমী সমাজে মূল্যবোধ এবং নৈতিক জগতের অন্তঃসারশূন্যতা নির্মমভাবে পাদপ্রদীপের সামনে নিয়ে আসে মূলত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ছাত্র-শিক্ষক সমাজ এবং দার্শনিক-সমাজবিজ্ঞানীদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদী আন্দোলন। এই আন্দোলনের তাত্ত্বিক ভিত্তিভূমি গড়ার কাজে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের অবদান ছিল বিশেষ লক্ষণীয়। এই সময়ে সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে-দুটি তাত্ত্বিক মূলধারা প্রবাহিত ছিল তার একটি হল মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পৃষ্ঠপোষকতায় এবং ট্যালকট পারসনসের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা অবয়ব-কার্যকারিতাবাদের তথা স্ট্রাকচারাল ফাংশনালিজম এবং প্রণালীবদ্ধতার তত্ত্ব তথা সিস্টেমস থিয়োরি যাতে জোর দেওয়া হয়েছিল দৃষ্টবাদ এবং অভিজ্ঞতাবাদের ওপর এবং অন্যটি ছিল সোভিয়েট রাশিয়ার নেতৃত্বে গড়ে ওঠা 'সরকারী' মার্ক্সবাদ। এই দুই চিন্তাধারার দৈন্যের প্রতিক্রিয়ায় উঠে আসছিল ইউরোপ থেকে অবয়ববাদী ও ঐতিহাসিক মার্ক্সবাদ এবং তৃতীয় বিশ্ব বিশেষ করে লাতিন আমেরিকা থেকে নব্য-মার্ক্সবাদ। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মাও-জে-দঙ-এর চিন্তাধারা। এই প্রেক্ষাপটে হার্বার্ট মার্কিউসের 'একমাত্রিক মানুষ' সারা বিশ্বে বাম এবং সমাজসচেতন মানুষের চিন্তাজগতে এক বিস্ফোরণের আকার নেয়। প্রলম্বিত ধনতন্ত্রের যথাযথ দার্শনিক-সমাজতাত্ত্বিক প্রতিচ্ছবি হিসাবে এই গ্রন্থ বুদ্ধিজীবী মহলে আদৃত হতে থাকে। আর ছাত্রসমাজে যে নামটি পূজিত হতে থাকে সেটি হল চে-গুয়েভারা। তিরিশের দশক থেকে গড়ে ওঠা ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের চিন্তাধারার ঐতিহ্য এই সময়ে প্রতিষ্ঠানবিরোধী চিন্তাধারার সামনে চলে আসে।

তিরিশের দশকের প্রায় অর্দ্ধবিস্মৃত লেখাগুলির পুনর্মূল্যায়নের পিছনে শুধু যে সমকালীন ছাত্রবিক্ষোভ এবং নতুনভাবে গড়ে ওঠা জার্মান মার্ক্সবাদই ক্রিয়াশীল ছিল তাই নয় নতুনভাবে জেগে ওঠা ফ্যাসিবাদ-বিরোধী জার্মান বিবেকও ইনস্টিটিউটের ঐতিহ্যকে সাগ্রহে বরণ করে নিয়েছিল। বস্তুত যুদ্ধপূর্ব কালের ভাইমার প্রজাতন্ত্র এবং যুদ্ধোত্তর কালের পশ্চিম জার্মানীর যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রের মধ্যে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলই ছিল সেই যৌথ প্রাতিষ্ঠানিক বন্ধন যা জার্মানীর অতীত এবং বর্তমানের মধ্যে একটা জীবন্ত সেতু রচনা করেছিল। ইনস্টিটিউট হয়ে উঠেছিল এক আত্মিক বন্ধনের প্রতীক। বিশ্বব্যাপী ধনতন্ত্রের সতেজ বিস্তার এবং সাংস্কৃতিক জগতের সর্বব্যাপী ক্ষয়িষ্ণুতা

ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের প্রথম প্রজন্মের চিন্তানায়কদের এক অন্ধ গলির দিকে ঠেলে দিলেও ইনস্টিটিউটের দ্বিতীয় প্রজন্মের লেখকরা এক পুনর্গঠিত তাত্ত্বিক ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়িয়ে এক নতুন যুগের আলোকবর্তিকার সন্ধানে ব্রতী হন। এঁদের মধ্যে পরবর্তীকালে সবচেয়ে যিনি বিখ্যাত হন তাঁর নাম অবশ্যই য়ুর্গেন হাবারমাস। বস্তুত সত্তরের দশক থেকেই ক্রিটিকাল থিয়োরির না হলেও ক্রিটিকাল সোশিওলজির চর্চা ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের গণ্ডী ছাড়িয়ে ইউরোপ আমেরিকা তথা সারা বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সমাজবিজ্ঞানচর্চার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে আদৃত হতে থাকে।

অসংখ্য রাজনৈতিক ভাষ্য রচনা করা ছাড়াও তাত্ত্বিক দিক থেকে হাবারমাস মূলত তিনটি পরস্পর সম্পৃক্ত বিষয়ে তাঁর বিশাল রচনাসম্ভারের অনেকটাই নিয়োজিত করেছেন। এগুলি হল—সমাজগবেষণার সঠিক পদ্ধতি, আধুনিক বিজ্ঞানের হাত ধরে সমাজজীবনের যান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে ওঠার সমস্যা এবং ধনতন্ত্রের 'উন্নত' স্তরে প্রকৃতি বিজ্ঞান, রাজনীতি এবং জনমত গঠনের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। সাম্প্রতিককালে আর যাঁরা চিন্তাজগতে অত্যন্ত মূল্যবান অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন রাজনৈতিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে ক্লস অফ্ এবং মনোবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আলফ্রেড লোরেঞ্জার। এঁদের দৃষ্টিভঙ্গির একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এই যে এঁরা মনে করেন সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র এবং চিন্তাজগতের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের পথ অন্বেষণের জন্য যেটা বিশেষভাবে প্রয়োজন সেটা হল প্রকাশ্য বিতর্ক। এবং সেই কারণে তাঁরা বিভিন্ন বিষয়ে সমকালীন প্রথম শ্রেণির তাত্ত্বিক বা রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে বারে বারেই প্রকাশ্য বিতর্কে লিপ্ত হয়েছেন—কার্ল পপার এবং অন্যান্যদের সঙ্গে, হারমেনিউটিক্স নিয়ে গ্যাডামারের সঙ্গে এবং সিস্টেমস্ থিয়োরি নিয়ে লোম্যানের সঙ্গে। এই সব বিতর্কের মধ্যে, বিশেষ করে সমাজবিজ্ঞানের পদ্ধতিগত বিতর্কে হাবারমাসের লেখায় তিরিশের দশকের ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের চিন্তাধারা মোটেই অস্পষ্ট নয়। তাছাড়া তিরিশের দশকে ইউরোপে টোটালিটেরিয়ানিজমের উদ্ভব এবং বিস্তারের ছায়ায় ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের প্রথম প্রজন্মের তাত্ত্বিকদের মধ্যে যে মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছিল আজকের দিনে আর এক নতুন ধরনের টোটালিটেরিয়ানিজমের পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনায় তাঁরা সেই চিন্তাধারার মধ্যে অনেক মূল্যবান উপাদানের সন্ধান পাচ্ছেন।

রচনাশৈলী

ক্রিটিকাল থিয়োরি সম্পর্কে গত কয়েক দশকে প্রচণ্ড আগ্রহের সৃষ্টি হলেও ক্রিটিকাল থিয়োরির ব্যাপ্তি এখনও কিছুটা সঙ্কীর্ণ। এর একটা কারণ অবশ্যই ভাষাগত ব্যবধান, যার কথা আমরা আগেই বলেছি। এ ছাড়াও আরও যে-কারণটি এর জন্য দায়ী সেটা হল ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের লেখকদের রচনাশৈলী। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের অধিকাংশ লেখকই জার্মান দার্শনিক ঐতিহ্যে গড়ে উঠেছেন। এঁদের লেখায় ভাষার সৌকর্যের চেয়ে উক্তির যাথার্থ্যই বিশেষভাবে গ্রাহ্য। কিন্তু তা ছাড়াও আরও যে কারণে ক্রিটিকাল থিয়োরি অনেকের কাছেই জটিল মনে হয় তা হল যে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের অনেকের লেখার মধ্যেই একটা নিটোল লেখার বদলে আমরা পাই ছোট ছোট কাটা কাটা উপমা আর তির্যক বাক্য। বিশেষ করে বেঞ্জামিনের এবং কিছুটা অ্যাডোর্নোর লেখায় এই রচনাকৌশল লক্ষ করা যায়। এর বিপরীত প্রান্তে অবশ্য ফ্রোমের লেখাও আছে। এঁরা যেন পাঠককে অতর্কিতে আঘাত করে তাঁর চিন্তার জড়তা ভেঙে দিয়ে তাঁকে নতুন করে ভাবতে আহ্বান করছেন। এই সব তির্যক বাক্য বা চিন্তার টুকরোগুলো একত্র করে কোনও একটা প্রণালীবদ্ধ রচনা

সৃষ্টির দিকে তাঁদের আগ্রহ কম। কিন্তু এসবের চেয়ে আর একটা জিনিস যেটা বিশেষভাবে এঁদের লেখায় লক্ষণীয় সেটা হল এই যে এঁরা মনে করেন যে ভাবাদর্শ শুধু যে সন্দর্ভের বিভিন্ন তাত্ত্বিক বক্তব্যেই প্রকাশ পায় তা নয়। ভাবাদর্শ ভাষার মজ্জায় মজ্জায় জড়িয়ে থাকে। তাই ভাবাদর্শকে ভাষার আদল থেকে কখনোই আলাদা করা যায়না। সেইজন্যে একদিকে যেমন সাংবাদিকতার অগভীর বাজার চলতি প্রকাশভঙ্গির প্রতি তাঁদের অবজ্ঞা তেমনি অনাস্থা কোনও কোনও দার্শনিক গোষ্ঠীর অস্বচ্ছ প্রকাশভঙ্গির ওপর। এছাড়া এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের অনেক লেখকই ছিলেন ইহুদি বংশোদ্ভুত। তাই ইহুদি ধর্মের যুক্তিপরম্পরার প্রকাশভঙ্গি তাঁদের লেখায় প্রতিফলিত হয়েছে।

বস্তুত জার্মানীতে দর্শনের ভিত্তিভূমি থেকে সমাজতত্ত্বকে সরিয়ে আনার প্রচেষ্টা শুরু হয় প্রথম মহাযুদ্ধের পরে। ঐ সময় থেকেই ভাববাদের আবরণ থেকে সমাজচিন্তাকে এক স্বচ্ছতার গণ্ডীতে নিয়ে আসার সচেতন প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। এমনকি দার্শনিক চিন্তাধারাতেও এর প্রভাব পড়ে। তারই প্রকাশ ঘটে অবভাসবাদ এবং অস্তিত্ববাদের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার বিস্তারে। হাইদেগারের লেখার মধ্যেও পাশাপাশি বাস্তব জীবন এবং সংস্কৃতির স্বচ্ছ বিশ্লেষণ এবং উত্তরণের সম্ভাব্য দিশার ভাববাদী ব্যাখ্যার সহাবস্থান লক্ষ করা যায়। পরবর্তী প্রজন্মের তাত্ত্বিকদের মধ্যে হাবারমাস অবশ্য অত্যন্ত সচেতনভাবে আবার দর্শনের জগতে প্রত্যাবর্তন করেন কারণ তাঁর মতে সমাজ বিশ্লেষণের সবচেয়ে বিশ্বস্ত হাতিয়ার হল দর্শন। জার্মান ঐতিহ্যের একটি মূল সূত্র তাঁর কাছে বিশেষ মূল্যবান। সেটা হল, সব আপাত-বিচ্ছিন্ন যুক্তিই আসলে একটি আনুক্রমিক অখণ্ড যুক্তিসূত্রে বিধৃত। এবং সেটা দার্শনিক পদ্ধতির সঠিক ব্যবহারের মধ্যেই সদর্থক এবং সফল হয়ে ওঠে। এই জন্যে হাবারমাসের লেখার মধ্যে এত সতর্কতা এবং গভীরতার ছাপ দেখা যায়, নিবন্ধের প্রচলিত ভাষার পাশে হাবারমাসের লেখা এত ভারী হয়ে ওঠে। সাধারণভাবে অবশ্য ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের প্রথম যুগের লেখাকে দুটি প্রান্তবিন্দুর মধ্যে ক্রমাগত সঞ্চরণ করতে দেখা যায়। এর একদিকে আছে বিপক্ষের মতবাদকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার প্রয়াস এবং অন্যদিকে আছে অত্যন্ত ক্ষুদ্র কোনও বস্তুকে গভীর বিশ্লেষণের মাধ্যমে এক ভাবগম্ভীর স্তরে উন্নীত করা।

ক্রিটিক

ক্রিটিকাল থিয়োরির (সমীক্ষণবাদ) মূলে যে কথাটি রয়েছে সেটা হল 'ক্রিটিক' (Critique বা সমীক্ষণ)। আমরা আগেই বলেছি যে হর্কহাইমার ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের গোড়াতেই মার্ক্সের 'Critique of Political Economy' -কে ইনস্টিটিউটের আদর্শ নমুনা বা প্রকৃত দৃষ্টান্ত বা প্যারাডাইম হিসাবে তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু যেহেতু মার্ক্সের আগেও 'ক্রিটিক' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে তাই কথাটার বিবর্তনের ইতিহাস এখানে বিশেষ প্রাসঙ্গিকতার দাবি করতে পারে। 'ক্রিটিক' শব্দটি আলোকপ্রাপ্তির যুগের প্রথম দিকে দার্শনিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এলেও এর ইতিহাস আরও পুরোনো। কথাটি প্রথম ব্যবহৃত হতে থাকে মানবতাবাদী এবং সংস্কারপন্থীদের লেখায় শাস্ত্র এবং কালোত্তীর্ণ রচনার সূক্ষ্ম বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে। তবে সেই সময় 'ক্রিটিক' দ্বিবিধ প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছিল। একদিকে যেমন ধর্মীয় সংস্কারবাদীরা ক্রিটিকের মাধ্যমে আদি ধর্মশাস্ত্রের মূল পাঠে ফিরে যাবার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন তেমনি সংস্কারবাদীরাও ক্রিটিককে

ব্যবহার করেছিলেন ক্যাথলিক চার্চের ঐতিহ্যকে ধরে রাখার প্রচেষ্টায়। শাস্ত্র এবং প্রতিষ্ঠান দুটিকে কেন্দ্র করে যে-বির্তক চলছিল তাতে 'ক্রিটিক' কথাটি এক সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছিল। কিন্তু কিছুদিন এই বিতর্ক চলতে থাকার পর এটা বোঝা যাচ্ছিল যে একদিকে আগমতত্ত্বের পুনর্প্রতিষ্ঠার প্রয়াস এবং অন্যদিকে যুক্তির মাধ্যমে শৃঙ্খলভাঙ্গার প্রচেষ্টার মাধ্যমে 'ক্রিটিক' কথাটি এক বিশেষ মাত্রা পেতে আরম্ভ করেছে, যা ধর্মের গণ্ডী ছাড়িয়ে নবোদ্ভুত যুক্তিবাদী সমাজের এক মূল উপাদান হিসাবে ক্রমশ উঠে আসছে। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে আমরা দেখি ইউরোপীয় চিন্তাজগতে জীবনের সব ক্ষেত্রেই যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূল হাতিয়ার হিসেবে ক্রিটিক নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তবে তখনও রাজনীতি বিশেষ করে রাষ্ট্রের ক্ষমতার পরিধির কোথায় শেষ হওয়া উচিত সে আলোচনা ক্রিটিকের বাইরেই রাখা হয়েছিল। কিন্তু জোয়ারের জলকে বেশিদিন বালির বাঁধ দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা যায়না। তাই যত দিন যেতে লাগল তত ক্রিটিকের অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে উঠল রাষ্ট্র পরিচালনার নীতির আলোচনা প্রথমে অপ্রত্যক্ষ এবং পরে অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে। আলাপচারিতায়, সভাসমিতি এবং ক্লাবে, কফিহাউস এবং পানশালায় গড়ে উঠতে থাকল এক নতুন প্রতিষ্ঠান, যার নাম 'পাবলিক' এবং যা থেকে উদ্ভব হতে আরম্ভ করল এক নতুন ধরনের নৈতিক কর্তৃত্বের। অসংখ্য পুস্তক, পুস্তিকা এবং প্রবন্ধের শিরোনামায় 'ক্রিটিক' কথাটি ব্যবহৃত হতে দেখা গেল। ১৭৮১ সালে কান্ট যে বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করলেন যুক্তির সার্বভৌমত্ব প্রমাণ করার জন্য তারও নাম দিলেন 'Critique of Pure Reason'। এই বইয়ের মুখপত্রে কান্ট বললেন যে, তিনি যে-যুগের মানুষ সেটা হল সত্যিকারের ক্রিটিকের যুগ, যে-ক্রিটিক ধর্ম কিংবা আইন প্রণয়ন কোনোটিকেই আলোচনার বাইরে রাখতে রাজি নয়। ক্রিটিক এখন একটা 'Public force' -এর রূপ নিয়েছে।

আলোকপ্রাপ্তির প্রতি ক্রিটিকাল থিয়োরির প্রবক্তাদের এই আনুগত্য এবং বোধহয় কিছুটা নস্টালজিয়াও হর্কহাইমার থেকে হাবারমাস প্রায় সকলের মধ্যেই পাওয়া যায়, বিশেষ করে তাঁদের 'ক্রিটিক' শব্দটির ব্যবহারের মধ্যে। এই 'ক্রিটিক'-এর মধ্যে তাঁরা বিপরীতধর্মী চিন্তাধারার অবাধ প্রকাশ এবং সংঘাতে সত্য নিরূপণের সঠিক পদ্ধতির সন্ধান পান। কিন্তু তা ছাড়াও ক্রিটিকের আরও দুটি অর্থ ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই অর্থদুটি জার্মান ভাববাদের সঙ্গে অন্বিত। প্রথম অর্থে, ক্রিটিক হল জ্ঞান আহরণের সম্ভাব্য শর্তগুলির নিরূপণ, অর্থাৎ কিভাবে জ্ঞান, বচন এবং ক্রিয়ার ক্ষমতা আয়ত্ত্ব করে। এটি কান্টের সূত্রে পাওয়া, যখন কান্ট কিভাবে প্রকৃতি বিজ্ঞানের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ সম্ভব এবং এই ধরনের জ্ঞানের সীমা কোথায় সেটা ব্যাখ্যা করেছেন। কান্ট বলেছিলেন বহির্জগতের বিচ্ছিন্ন প্রতিবিম্বিত ধারণাগুলি আমাদের চেতনার মাধ্যমেই একটা সামগ্রিক রূপ পায়। কান্টের এই মূলগত চিন্তা আমাদের যুগে ভাষাতত্ত্বের 'Generative rules', 'Linguistic competence' ইত্যাদি ধারণার মধ্যে নতুনভাবে বিধৃত হয়েছে। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের দ্বিতীয় প্রজন্মের লেখকদের মধ্যে এইসব চিন্তা বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু এ-ছাড়াও ক্রিটিকের আরও একটি অর্থ রয়েছে। সেই অর্থের মূলে যে-ধারণা তার মূল কথা হল সত্য অনেক ক্ষেত্রেই স্বতঃপ্রকট নয়। সব সমাজেই সত্যকে আবৃত করে থাকে অনেক অস্বচ্ছ পর্দা। এই সব বাধা মানুষের তৈরি, সমাজের তৈরি। এইসব বাধার উপলব্ধি, ব্যাখ্যা এবং অপসারণ না হলে সত্যকে কখনও সঠিকভাবে নির্দ্ধারণ করা যায়না। হেগেলও বলেছেন এইসব

'Coercive illusion' থেকে উত্তরণ সত্য উপলব্ধির অন্যতম প্রধান শর্ত। এইসব মিথ্যা ভাবনাগুলি একদিকে যেমন সামাজিক চেতনার প্রসারকে ব্যাহত করে, তেমনি ব্যক্তিমনের ক্ষেত্রেও অনেক সমস্যা সৃষ্টি করে। ফ্রয়েডও বলেছিলেন ব্যক্তিচেতনা যখন অন্তর্নিহিত সংঘাতের চেহারাটা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে তখনই সে তার অবদমিত সত্তার মুখোমুখি হয়, এবং তখনই তার মানসিক ভারসাম্য ফিরে আসে। তেমনি সামাজিক ক্ষেত্রেও অবদমনের মাধ্যমে যে মিথ্যা-চেতনা সমাজমনকে আচ্ছন্ন করে থাকে তার নির্মম বিশ্লেষণের মাধ্যমেই সত্যের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা যায়। সমাজচিন্তা এবং সমাজ বিশ্লেষণের মূল চালিকাশক্তি এটাই হওয়া উচিত।

আমরা স্বল্প কথায় 'ক্রিটিক' প্রসঙ্গে এই যে দুটি অর্থের উল্লেখ করলাম এর প্রথমটির লক্ষ্য হল পুনর্গঠন এবং দ্বিতীয়টির লক্ষ্য হল বিশ্লেষণ। এই দুটির মধ্যে অন্তত তিন ধরনের পার্থক্য লক্ষ করা যায়। প্রথমত, পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে কয়েকটি আপাত অজ্ঞাত নিয়ম-নীতি, যেগুলি আয়ত্ত্ব করেই ব্যক্তি সমাজকে সঠিকভাবে দেখার দক্ষতা অর্জন করতে পারে। এটি একটি সাধারণ দক্ষতা, কোনও বিশেষ বস্তু বা ঘটনা নির্ভর নয়। অন্যদিকে বিশ্লেষণ বা সমালোচনার লক্ষ্য হল বিশেষ কোনও বস্তু বা ঘটনা। দ্বিতীয়ত পুনর্গঠন নির্ভর করে সেই সমস্ত উপাত্তের উপর যেগুলি বস্তুনির্ভর এবং ন্যায্য। অপরপক্ষে বিশ্লেষণ শুধু যে এই ন্যায্যতার দাবিকেই নস্যাৎ করতে চায় তাই নয় তার বিকৃতিকেও নগ্নভাবে তুলে ধরতে চেষ্টা করে। এই বিশ্লেষণী মনোভাবের পিছনে যে উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল তা হল যে এইসব বিকৃতির অপনোদন না ঘটলে মুক্তি কখনও সম্ভব নয়। তৃতীয়ত, পুনর্গঠন ব্যাখ্যা করে কীভাবে সঠিক জ্ঞানলাভ সম্ভব, অর্থাৎ জ্ঞানলাভের প্রাথমিক শর্তগুলি কী। আর বিশ্লেষণী চিন্তার একান্ত প্রয়াস হল এমনকি এইসব শর্তগুলিরও মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনবোধে তার পরিবর্তন। সহজভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যেখানে সর্ষের মধ্যেই ভূত সেখানে ভূত তাড়াতে হলে সর্ষের শোধন একান্ত প্রয়োজন। প্রথমটিতে বিশেষ কোনও সমাজের বিশেষ কোনও সময়ের কাছে গ্রাহ্য শর্তগুলির মধ্যেই কেবল জ্ঞানের বিস্তৃতি বা প্রসার ঘটা সম্ভব এমনটাই মনে করা হয়। এই ক্ষেত্রে বাস্তবজগতের সত্যিকারের পরিবর্তনের সম্ভাবনার উন্মেষ ঘটার সম্ভাবনা কম। কিন্তু বিশ্লেষণের মূল লক্ষই হল যা অস্বচ্ছ তাকে স্বচ্ছ করা এবং যা অদৃশ্য তাকে দৃশ্যপটে নিয়ে আসা। বিশ্লেষণী চিন্তা ব্যক্তি এবং সমাজমনে এক আত্মজিজ্ঞাসার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে, তাদের পরিচিতি ঘটায় অবদমনের মূল কারণ এবং পদ্ধতিগুলির সঙ্গে। আর এখানেই সৃষ্টি হয় সমাজপরিবর্তনের সম্ভাবনা।

ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের আলোচনা প্রসঙ্গে আলোকপ্রাপ্তির ঐতিহ্যে গড়ে ওঠা 'ক্রিটিকের' এই দ্বিবিধ অর্থ মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয়ের দিকেও দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। হর্কহাইমার, অ্যাডোর্নো, মার্কিউস এবং হাবারমাস জার্মান ইতিহাস-দর্শনের অনেক কিছুই স্বীকার করেন না। ধনতন্ত্রের সাম্প্রতিক স্তরে শ্রমিক শ্রেণি বা সর্বহারাদের ইতিহাসের নিয়ন্তা হয়ে ওঠার কোনও সম্ভাবনা আছে একথাও তাঁরা মনে করেন না। কিন্তু আলোকপ্রাপ্তির সূত্রে উঠে আসা সমাজপরিবর্তনের এক উজ্জ্বল সম্ভাবনা যার মধ্যে মানুষের সার্বিক স্ফূর্তি মূর্ত হতে পারে তার প্রতি তাঁদের প্রগাঢ় আস্থা অবিচল। (অবশ্য হর্কহাইমার এবং অ্যাডোর্নো এ-বিষয়েও ক্রমশ সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন)। মার্কিউসের কথাই ধরা যাক। অনেকেই মনে করেন তাঁর লেখার

ইতিহাসের একটি দ্বিমাত্রিক দৃষ্টিকোণ পাওয়া যায়। এর প্রথম মাত্রায় ধরা পড়েছে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এমনকি যৌন অবদমনের চিত্র। কিন্তু তাঁর লেখার দ্বিতীয় মাত্রায় মূর্ত হয়েছে মানুষের এবং মানবসমাজের একটি উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যমুখিনতা—মানবসমাজের একটা আদর্শগত দিক। এই দ্বিতীয় স্তর থেকেই উদ্ভূত হয় সমাজপরিবর্তনের প্রেরণা। হাবারমাসও জ্ঞানার্জনস্পৃহার মূলগত কারণের যে শ্রেণিবিভাগ করেছেন তাতেও ব্যক্তিগত এবং সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অবদমন থেকে মুক্তিলাভের মাধ্যমে এক সামাজিক উত্তরণের স্পৃহাকে মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত করেছেন।

চার অধ্যায়

ক্রিটিকাল থিয়োরির তন্নিষ্ঠ পাঠকরা ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের চিন্তাধারাকে মোটামুটি চার অধ্যায় বা চার পর্বে ভাগ করেছেন। এর প্রতিটি পর্বের লেখায় এক এক ধরনের সমস্যা এবং তার বিশ্লেষণপদ্ধতির মধ্যে ঐ স্কুলের ভাবনার এক প্রবহমান ধারার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম পর্বের লেখায় দেখা যায় যে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের চিন্তাবিদরা মার্ক্সের চিন্তাধারা থেকে কিছুটা সরে গিয়ে একথা বলার চেষ্টা করছেন যে ভাবাদর্শের প্রভাব শুধু যে সংলাপী যুক্তিবদ্ধ বাক্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে একথা মনে করা ঠিক নয়। মার্ক্স দেখিয়েছিলেন যে, উদারনৈতিক অর্থনীতিবিদরা যে-সমস্ত অনুজ্ঞাগুলিকে সার্বিক বলে ধরে নিয়ে তাঁদের তত্ত্বকে খাড়া করেছিলেন সেগুলি আদৌ সার্বিক নয়, বরং তাদের বিকৃতি যা উদারনৈতিক ধনতন্ত্রেরই ফসল। এই প্রসঙ্গে মার্ক্স দেখিয়েছিলেন যে ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং সাধারণ-স্বার্থের বৈপরীত্যের ফলেই ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় বস্তুর উৎপাদন মানুষের প্রয়োজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্রমশ স্বনির্ভর হয়ে উঠতে থাকে। মার্ক্স বলেছিলেন যে বিনিময় মূল্য সঠিকভাবে বস্তুর ব্যবহারিক মূল্যকে প্রতিবিম্বিত করে না। আরও যেটা লক্ষণীয় সেটা হল, পুঁজির চরিত্র এবং বুর্জোয়া সমাজে পণ্যকে পূজার আসনে বসানোর প্রচেষ্টার কারণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে মার্ক্স ধনতান্ত্রিক সমাজের একটা পূর্ণাবয়ব ক্রিটিক তৈরি করতে চেয়েছিলেন। এখানে যেটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় সেটা হল এই যে সমাজবিশ্লেষণের পদ্ধতি হিসাবে মার্ক্স বুর্জোয়া অনুজ্ঞাগুলিকেই তাঁর ক্রিটিকের বিষয়বস্তু হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন।

কিন্তু ফ্রাঙ্কফুর্টের তাত্ত্বিকরা বললেন, পশ্চিম ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকায় অত্যন্ত সংগঠিত ধনতন্ত্র এবং জার্মানীতে ফ্যাসিবাদের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে উদারনৈতিক ধনতন্ত্র এবং উদারনৈতিক যৌক্তিকতা হারিয়েছে। সেগুলির মাধ্যমে সমকালীন সামাজিক সংকটকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যায়না। বিশেষ করে প্রভুত্ব বিস্তারের নতুন পদ্ধতিগুলি কোনোভাবেই এইসব ক্যাটিগরির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা যায়না। একদিকে ফ্যাসিবাদ যেমন দেখিয়েছে মুদ্রণ এবং বৈদ্যুতিন যন্ত্রকে কিভাবে যূথবদ্ধকরণের কাজে ব্যবহার করা যায়, তেমনি পশ্চিমী দুনিয়ার পরিণত ধনতন্ত্র দেখিয়েছে কীভাবে সেই প্রচার-মাধ্যমগুলির ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও একটা পরিবর্তন আনা যায়। তাঁরা আরও বললেন যে সাম্প্রতিককালে শিল্পজগতের অভূতপূর্ব উন্নতির যুগে প্রচারমাধ্যমের সুকৌশল প্রয়োগ শুধু যে আমাদের চেতনাকেই আচ্ছন্ন করে রাখছে তাই নয়, সেগুলি কলা এবং চারুশিল্পের মত অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়ে আমাদের ব্যক্তিগত এবং সামগ্রিক জীবনকেও নিয়ন্ত্রিত করতে আরম্ভ করেছে। প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে যন্ত্রশিল্প

শ্রম-বাজার ছেড়ে বিনোদন জগতেও অনুপ্রবেশ করে আমাদের সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক চাহিদাগুলিকেও নিজের প্রয়োজনে গড়েপিটে নিয়ে আমরা কী কিনব তাও নিয়ন্ত্রণ করছে। তাঁদের প্রথম পর্যায়ের লেখায় ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের তাত্ত্বিকরা প্রলম্বিত ধনতন্ত্রের যুগের উদারনৈতিক গণতন্ত্র এবং ফ্যাসিবাদের মধ্যে বিশেষ কোনও প্রভেদ আছে বলে মনে করতেন না। কারণ তাঁরা মনে করতেন রাজনৈতিক প্রচার এবং আগ্রাসী বিপণন মানুষের চাহিদা, তার মন এবং তার বিচারবুদ্ধিকে প্রায় একইভাবে প্রভাবিত করে। উভয়ক্ষেত্রেই কৃত্রিম দাবী এবং কৃত্রিম চাহিদা তৈরির ঝোঁক প্রায় একই রকম। উভয়ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি চাপা পড়ে এক আপতিক বিচার প্রাধান্য পায়। মনের অন্তর্নিহিত বাসনার জায়গায় উঠে আসে বাইরের জগতের অসংখ্য ইঙ্গিতের মাধ্যমে সৃষ্ট প্রলোভন। এইভাবে অসংখ্য ব্যক্তিমনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঠামোগুলি একটা কৃত্রিম উপরিকাঠামো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল মনে করে পুরোনো অনুজ্ঞাগুলি দিয়ে সাম্প্রতিক এই অবস্থার সঠিক ব্যাখ্যা সম্ভব নয়।

ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের লেখকরা তাই পুরনো ক্রিটিকগুলি নতুনভাবে ঢেলে সাজাবার কথা বললেন। তাঁরা বললেন 'ক্ল্যাসিকাল আইডিওলজি ক্রিটিক'কে সামাজিক মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রসারিত করা দরকার। তাঁরা আরও বললেন যে বর্তমান সমাজের সংকটকে বুঝতে গেলে একদিকে যেমন প্রয়োজন তার ঐতিহাসিক অবস্থার সঠিক বিশ্লেষণ তেমনি প্রয়োজন এই সমাজের মানসিক গড়নেরও সঠিক বিচার। তাঁরা দেখালেন যে মানুষের প্রয়োজন বা চাহিদা কোনও প্রকৃতিদত্ত জিনিস নয়, তা বিভিন্ন সমাজে ঐতিহাসিকভাবে নির্দ্ধারিত হয়। তাই যদি হয় তাহলে বিশেষ কোনও সামাজিক অবস্থান কীভাবে মানুষের মনের মধ্যে গচ্ছিত হয়, কীভাবে তার চাহিদাকে নির্দ্ধারণ করে সেটা বোঝা একান্ত প্রয়োজন। তাঁদের মতে পরিবারই হল সেই মাধ্যম যার মধ্য দিয়ে এই সামাজিকীকরণ ঘটে থাকে, যার মধ্য দিয়ে বহির্জগতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রভাব মানুষের অন্তর্লোকে চেপে বসে। তাই পরিবার-ভিত্তিক গবেষণার ওপর তাঁরা বিশেষ জোর দিলেন। তাঁদের গবেষণা প্রকল্পের মাধ্যমে তাঁরা ধরার চেষ্টা করলেন কীভাবে পরিবারের মাধ্যমে ফ্যাসিবাদ প্রভুত্ববাদী ব্যক্তিত্ব তৈরি করে। সেই সঙ্গে সাহিত্য, সঙ্গীত, চারুকলার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণেও তাঁরা নিজেদের নিয়োগ করলেন, বিশেষভাবে অ্যাডোর্নো এবং বেঞ্জামিন। তাঁরা দেখালেন নান্দনিক চিন্তার মধ্যে অস্পষ্ট হলেও একটা কল্পলোকের ছায়া পড়ে। সেইজন্য শিল্পকলার মধ্যে সবসময়েই একটা বিশ্লেষণী অন্তর্দৃষ্টি থাকে যার প্রভাব সাধারণভাবে মুক্তিদায়ী। মানবমনের ওপর চারুকলার এই গভীর প্রভাবের জন্য বহুক্ষেত্রেই তাকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে মানুষের মনের মধ্যে কৃত্রিম চাহিদার সৃষ্টি করা হয়। তার প্রয়োজনের ছাঁচে ঢেলে প্রভুত্ববাদী সমাজ মানুষের মনকে নিজের মতো করে গড়ে নেবার চেষ্টা করে। এইভাবে অলীক ভাবাদর্শের সৃষ্টি হয় যা মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। বুর্জোয়া সমাজে শিল্পকলাও বাজারী পণ্য হয়ে ওঠে এবং অন্যান্য পণ্যের মতো তাও হয়ে ওঠে fetishized। বিশেষ করে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের হাত ধরে শিল্পকলা তার বিশেষ স্থানিক ভিত্তিভূমি থেকে উৎখাত হয়ে একটা সাংস্কৃতিক অধ্যাসের মতো হাওয়ায় ভাসতে থাকে।

ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের দ্বিতীয় পর্বে আমরা দেখি যে এই সময়ে মার্ক্সবাদ থেকে প্রতিসরণ আরও গভীরতর হয়েছে। মার্ক্স বলেছিলেন পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পণ্যের ক্রমাগত উৎপাদনবৃদ্ধির ঝোঁক

শেষ পর্যন্ত তার সর্বনাশ ডেকে আনবে। কারণ, ইতিহাস আমাদের বলে উৎপাদনের পদ্ধতি এবং উৎপাদন সম্পর্কের সংঘাতের ফলেই নতুন সমাজব্যবস্থার দরজা খুলে যায়। উৎপাদন পদ্ধতি সাধারণভাবে নির্ভর করে বিজ্ঞান, যন্ত্র, কারিগরি বিদ্যা এবং শ্রম-সংগঠনের ওপর। আর উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে ওঠে সম্পত্তির বন্টনের ওপর নির্ভর করে। মার্ক্সের মতে বুর্জোয়া সমাজকে যদি টিকৈ থাকতে হয় তাহলে তাকে উৎপাদন-সম্পর্ক অটুট রেখে ক্রমাগত উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতি ঘটিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ উৎপাদন যতই বাড়ুক না কেন তার বন্টনে সমতা আসবে না, অর্থাৎ দারিদ্র্য এবং শোষণ কোনোভাবেই কমবে না। আর তার ফলেই সেখানে কোনও না কোনও সময়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসতে বাধ্য। এই বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবে শ্রমিক শ্রেণি, যার ফলে এক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সূত্রপাত হবে। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের লেখকরা বললেন ইউরোপ আমেরিকায় ধনতন্ত্রের বর্তমান স্তরে কিন্তু এমনটি ঘটার সম্ভাবনা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। বরং বলা যায় উৎপাদনের পদ্ধতি এবং উৎপাদন কৌশলের অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে বিপ্লবের সম্ভাবনা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। এই উন্নতি এক ঐতিহাসিক বিস্ফোরণের সম্ভাবনা তো সৃষ্টি করছেই না বরং বর্তমান অবস্থাকে টিঁকিয়ে রাখতেই সাহায্য করছে। এখন এটা জোরের সঙ্গে বলা হচ্ছে যে বুর্জোয়া সমাজ যুক্তিবাদী সমাজ গঠনের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ সাংগঠনিক ব্যবস্থা। উৎপাদনের ক্ষেত্রেও সাংগঠনিক এবং পরিচালন-ব্যবস্থার ক্রমাগত উন্নতি ঘটছে এবং রাষ্ট্র বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে শ্রমিক এবং অন্যান্য নিপীড়িত শ্রেণির অসন্তোষকে নিজের আয়ত্বের বাইরে যেতে দিচ্ছে না। এইসব ঘটনা একটা দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে, যেটা হল এই যে উৎপাদন ব্যবস্থার সাম্প্রতিক উন্নততর অবস্থায় উৎপাদন সম্পর্ক বর্তমান ব্যবস্থার মধ্যেই প্রয়োজনীয় নমনীয়তার মাধ্যমে নিজেকে নতুনভাবে গড়ে নিতে পেরেছে। অর্থাৎ আগে যার মধ্যে আধুনিক সমাজের ক্ষমতার কাঠামোর একটা ক্রিটিক লুকিয়ে ছিল আজ সেখানেই আমরা পাচ্ছি ক্ষমতার বৈধীকরণের একটি ব্যবস্থা। হর্কহাইমারের 'Dialectics of Enlightenment' এর মধ্যে আমরা এই ধরনের চিন্তার প্রকাশ দেখি।

এর থেকে আর এক ধাপ এগিয়ে তাঁরা আরও বললেন যে ধনতন্ত্রের এই প্রাগ্রসর যুগে কৃৎকৌশল যেমন একদিকে ধ্বংসের মাধ্যমে না হয়ে ধনতন্ত্রের এক শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে কাজ করছে তেমনি অন্যদিকে সর্বহারাদের বিপ্লবের সম্ভাবনাকেও নিষ্ক্রিয় করে দিচ্ছে। তার বদলে যেটা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে সেটা হল দু'ধরনের 'যুক্তির ধারণার' সংঘাত। যুক্তির এই দুটি ধরনের একটি হল ব্যবহারিক যুক্তি এবং অন্যটি হল যান্ত্রিক যুক্তি। ব্যবহারিক যুক্তি বহির্জগত দ্বারা আরোপিত বিভিন্ন বাধ্যতা থেকে মুক্তি পেতে আমাদের সহায়ক হয়ে ব্যক্তিগত এবং সমিষ্টিগতভাবে এক পূর্ণতর এবং উন্নততর জীবনের দিশা নির্ণয়ে আমাদের পাথেয় হয়। কিন্তু কৃৎকৌশলগত বা যান্ত্রিক যুক্তির লক্ষ্য একটাই। সেটা হল প্রকৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তার। আধুনিক যুগে প্রকৃতি-বিজ্ঞান এবং কৃৎকৌশলের উন্নতির মধ্যে আমরা তার স্ফুরণ লক্ষ করি। অ্যাডোর্নো এবং হর্কহাইমার বললেন বর্তমান সমাজের সংকটের অন্যতম মূল কারণ হল প্রথম ধরনের যুক্তির ওপর দ্বিতীয় ধরনের যুক্তির একাধিপত্য। যেটার মূল লক্ষ্য ছিল প্রকৃতিকে নিজের অধীনে আনা, তা এখন প্রশাসনিক ব্যবস্থার ক্রমাগত উন্নতির মাধ্যমে মানুষকে এবং সমাজকে নিজের কর্তৃত্বে আনার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। আলোকপ্রাপ্তির যুগে যে যুক্তিবোধ মানবমুক্তির আলোকবর্তিকা

শেষ পর্যন্ত তার সর্বনাশ ডেকে আনবে। কারণ, ইতিহাস আমাদের বলে উৎপাদনের পদ্ধতি এবং উৎপাদন সম্পর্কের সংঘাতের ফলেই নতুন সমাজব্যবস্থার দরজা খুলে যায়। উৎপাদন পদ্ধতি সাধারণভাবে নির্ভর করে বিজ্ঞান, যন্ত্র, কারিগরি বিদ্যা এবং শ্রম-সংগঠনের ওপর। আর উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে ওঠে সম্পত্তির বন্টনের ওপর নির্ভর করে। মার্ক্সের মতে বুর্জোয়া সমাজকে যদি টিঁকে থাকতে হয় তাহলে তাকে উৎপাদন-সম্পর্ক অটুট রেখে ক্রমাগত উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতি ঘটিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ উৎপাদন যতই বাড়ুক না কেন তার বন্টনে সমতা আসবে না, অর্থাৎ দারিদ্র্য এবং শোষণ কোনোভাবেই কমবে না। আর তার ফলেই সেখানে কোনও না কোনও সময়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসতে বাধ্য। এই বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবে শ্রমিক শ্রেণি, যার ফলে এক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সূত্রপাত হবে। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের লেখকরা বললেন ইউরোপ আমেরিকায় ধনতন্ত্রের বর্তমান স্তরে কিন্তু এমনটি ঘটার সম্ভাবনা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। বরং বলা যায় উৎপাদনের পদ্ধতি এবং উৎপাদন কৌশলের অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে বিপ্লবের সম্ভাবনা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। এই উন্নতি এক ঐতিহাসিক বিস্ফোরণের সম্ভাবনা তো সৃষ্টি করছেই না বরং বর্তমান অবস্থাকে টিঁকিয়ে রাখতেই সাহায্য করছে। এখন এটা জোরের সঙ্গে বলা হচ্ছে যে বুর্জোয়া সমাজ যুক্তিবাদী সমাজ গঠনের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ সাংগঠনিক ব্যবস্থা। উৎপাদনের ক্ষেত্রেও সাংগঠনিক এবং পরিচালন-ব্যবস্থার ক্রমাগত উন্নতি ঘটছে এবং রাষ্ট্র বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে শ্রমিক এবং অন্যান্য নিপীড়িত শ্রেণির অসন্তোষকে নিজের আয়ত্বের বাইরে যেতে দিচ্ছে না। এইসব ঘটনা একটা দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে, যেটা হল এই যে উৎপাদন ব্যবস্থার সাম্প্রতিক উন্নততর অবস্থায় উৎপাদন সম্পর্ক বর্তমান ব্যবস্থার মধ্যেই প্রয়োজনীয় নমনীয়তার মাধ্যমে নিজেকে নতুনভাবে গড়ে নিতে পেরেছে। অর্থাৎ আগে যার মধ্যে আধুনিক সমাজের ক্ষমতার কাঠামোর একটা ক্রিটিক লুকিয়ে ছিল আজ সেখানেই আমরা পাচ্ছি ক্ষমতার বৈধীকরণের একটি ব্যবস্থা। হর্কহাইমারের 'Dialectics of Enlightenment' এর মধ্যে আমরা এই ধরনের চিন্তার প্রকাশ দেখি।

এর থেকে আর এক ধাপ এগিয়ে তাঁরা আরও বললেন যে ধনতন্ত্রের এই প্রাগ্রসর যুগে কৃৎকৌশল যেমন একদিকে ধ্বংসের মাধ্যমে না হয়ে ধনতন্ত্রের এক শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে কাজ করছে তেমনি অন্যদিকে সর্বহারাদের বিপ্লবের সম্ভাবনাকেও নিষ্ক্রিয় করে দিচ্ছে। তার বদলে যেটা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে সেটা হল দু'ধরনের 'যুক্তির ধারণার' সংঘাত। যুক্তির এই দুটি ধরনের একটি হল ব্যবহারিক যুক্তি এবং অন্যটি হল যান্ত্রিক যুক্তি। ব্যবহারিক যুক্তি বহির্জগত দ্বারা আরোপিত বিভিন্ন বাধ্যতা থেকে মুক্তি পেতে আমাদের সহায়ক হয়ে ব্যক্তিগত এবং সমিষ্টগতভাবে এক পূর্ণতর এবং উন্নততর জীবনের দিশা নির্ণয়ে আমাদের পাথেয় হয়। কিন্তু কৃৎকৌশলগত বা যান্ত্রিক যুক্তির লক্ষ্য একটাই। সেটা হল প্রকৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তার। আধুনিক যুগে প্রকৃতি-বিজ্ঞান এবং কৃৎকৌশলের উন্নতির মধ্যে আমরা তার স্ফুরণ লক্ষ করি। অ্যাডোর্নো এবং হর্কহাইমার বললেন বর্তমান সমাজের সংকটের অন্যতম মূল কারণ হল প্রথম ধরনের যুক্তির ওপর দ্বিতীয় ধরনের যুক্তির একাধিপত্য। যেটার মূল লক্ষ্য ছিল প্রকৃতিকে নিজের অধীনে আনা, তা এখন প্রশাসনিক ব্যবস্থার ক্রমাগত উন্নতির মাধ্যমে মানুষকে এবং সমাজকে নিজের কর্তৃত্বে আনার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। আলোকপ্রাপ্তির যুগে যে যুক্তিবোধ মানবমুক্তির আলোকবর্তিকা

দেখিয়েছিল সেটাই এখন পুঁজিবাদের দাসত্ব করছে। যার ফলশ্রুতিতে আমরা পাচ্ছি টোটালিটেরিয়ানিজম আর ফ্যাসিজম। যান্ত্রিক যুক্তির চমকপ্রদ সাফল্য ব্যবহারিক যুক্তির মাধ্যমে কাম্য, সুস্থ এবং উন্নততর জীবনের অন্বেষণ-প্রচেষ্টাকে ক্রমশ দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। মার্ক্স পণ্য বিনিময়কে যেখানে সম্পত্তির মালিকানার এক বিশেষ সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে দেখেছিলেন, অ্যাডোর্নো এবং হর্কহাইমার সেখানে দেখলেন যান্ত্রিক যুক্তিবাদের এক পূর্ণাঙ্গীন প্রকাশ। এখন প্রশ্ন হল যান্ত্রিক যুক্তিবাদিতার এই সামাজিক আধিপত্য কি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ক্রমাগত বিকাশের জন্যেই সম্ভব হয়েছে, নাকি আলোকপ্রাপ্তির ইতিহাসের মধ্যেই এর বীজ লুকিয়ে ছিল? উত্তরটা যাই হোক, হর্কহাইমার এবং অ্যাডোর্নোর মতে শুধুই ক্রিটিক অফ্ পলিটিক্যাল ইকনমির মধ্যে আমরা আর উত্তরণের পথ পাব না যদি না একই সঙ্গে সেই ক্রিটিককে ক্রিটিক অব্ ইনস্ট্রুমেন্টাল রিজন-এর মধ্যেও প্রসারিত না করা যায়।

অ্যাডোর্নো এবং হর্কহাইমার তাঁদের লেখার অনেক জায়গায় সর্বহারাদের দ্বারা কোনও বিপ্লবের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতার সম্ভাবনার ক্রম-অপসারণের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁরা মনে করেন এটাও যান্ত্রিক যুক্তিবাদিতার পরিণতি। তাঁরা মনে করেন সাম্প্রতিককালের সচ্ছল এবং মসৃণভাবে চলা পুঁজিবাদী সমাজে এমনকি সর্বহারা শ্রেণির প্রয়োজন এবং অভাবের অভিজ্ঞতার ধারও বাহ্যিক চাকচিক্যের ফলে ভোঁতা হয়ে যায় যার ফলে প্রতিবাদের রাজনৈতিক বহির্প্রকাশও ব্যাহত হয়। সেই কারণে এই ধরনের সমাজ-ব্যবস্থায় মুক্তির বাসনার কোনও গণভিত্তি গড়ে ওঠেনা। কিন্তু এই রাজনৈতিক বন্ধ্যাত্বের প্রশ্নটিকে অ্যাডোর্নো এবং হর্কহাইমারের চেয়ে যিনি আরও বেশি সামনে নিয়ে এসেছিলেন তিনি হলেন হার্বার্ট মার্কিউস। এটাকেই ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের তৃতীয় অধ্যায় বলে চিহ্নিত করা যায়।

মার্কিউস মনে করেন বর্তমান সঙ্কট থেকে উত্তরণের পথ খুঁজতে হলে প্রচলিত ধারণা থেকে সরে এসে সমাজমনের কোন্ কোণে সংঘাতের সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে তাকে খুঁজে বার করা প্রয়োজন। যেহেতু বর্তমান সচ্ছল সমাজে যে-অর্থনৈতিক প্রেষণার কথা মার্ক্স উল্লেখ করেছেন তা আর কার্যকরী হচ্ছেনা তাই আমাদের দৃষ্টি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক থেকে কিছুটা সরিয়ে এনে গণমনস্তত্ত্বের প্রতি বিশেষ করে নিবদ্ধ করতে হবে। সেটা করলে বিশেষ কোনও শ্রেণি বা প্রতিষ্ঠানের বদলে অন্য কোনও সামাজিক ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে নতুন একটা ক্রিটিক তৈরি করতে হবে। মার্কিউস আগেই ডায়ালেকটিকস অব্ এনলাইটেনমেন্টের সূত্র ধরে তাঁর 'একমাত্রিক মানুষ'এ প্রয়োগ-কৌশলগত যুক্তিবাদিতাকে তাঁর ক্রিটিকের বিষয়বস্তু করেছিলেন। এখন 'Eros and Civilization'-এ তিনি ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের কিছুটা সংশোধনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক শোষণের বদলে সহজাত প্রবৃত্তির অবদমনের ধারণাটিকে তাঁর আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এলেন। এখানে সংঘাতের মূল বিষয় হিসেবে যেটাকে তুলে ধরা হয়েছে তা হল কৃৎকৌশলগত যুক্তিবাদিতার সঙ্গে মানুষের অব্যক্ত চাহিদাগুলির মূলগত বিরোধ।

ফ্রয়েডের লেখা থেকে যা বেরিয়ে আসে সেটা হল মানব-সভ্যতার ইতিহাস হল অবদমনের ইতিহাস। সভ্যতার মূল কথাটি হল মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিকে দমন করে তাকে সামাজিক প্রয়োজনে নিয়োগ করা। এটাই হল সুখবোধের নীতি থেকে বাস্তববোধের নীতিতে উত্তরণ।

মার্কিউস এই ফ্রয়েডীয় তত্ত্বকে কিছুটা সংশোধন করে বললেন যে অবদমন সার্বিক হলেও অবদমনের বিশেষ ধরন সহজাত প্রবৃত্তির প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে না। তা নির্ভর করে বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থার ওপর, যার প্রভাবে সহজাত প্রবৃত্তি নিজেকে গড়েপিটে নিতে বাধ্য হয়। তার মানে এই দাঁড়ায় যে, যেটাকে বাস্তবিকতার নীতি বলা হয় সেটা বিশেষ সমাজের সংস্কৃতি নির্ভর। কিন্তু যে সামাজিক ব্যবস্থায় অনটন অনেকটাই দূরীভূত হয়েছে সেখানে অবদমন হয়ে দাঁড়ায় 'উদ্বৃত্ত অবদমন'; অর্থাৎ সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য যতটুকু অবদমনের প্রয়োজন হয় তার চেয়ে বেশি অবদমন। কারণ অবদমনের মূলে আছে অনটনকে সহ্যের সীমার মধ্যে রাখার জন্য সহজাত প্রবৃত্তিগুলির অবদমন।

এই যুক্তি পরম্পরার মাধ্যমে মার্কিউস দেখাতে চাইলেন যে কৃৎকৌশলগত যুক্তি, এবং সেই ধরনের সমাজ যার মূল চালিকাশক্তি হল যান্ত্রিক দক্ষতা তা' মূলত আত্ম-বিধ্বংসী। কারণ কৃৎকৌশলের ক্রমাগত উন্নতি হতে থাকলে তা' অবদমনের বিরুদ্ধে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। তার মানে হল এই যে, দৈনন্দিন প্রয়োজনের জন্য বস্তুর উৎপাদনের সময় যত কমতে থাকে তত প্রবৃত্তিকে সংযত রাখার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয়, তার অনেকটাই উদ্বৃত্ত হয়ে দাঁড়ায়। তখন সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রবৃত্তিকে দমনে রাখার ব্যবস্থাপনার আর তত প্রয়োজন হয়না। প্রাগ্রসর শিল্প-নির্ভর সমাজে এমন একটা বাতাবরণের সৃষ্টি করে যে মনে হয় কল্পলোক মানুষের আয়ত্তাধীন হতে আর দেরি নেই। তাই মানুষের ভাবরাজ্যে সমস্ত বাধা কাটিয়ে সেই কল্পরাজ্যকে বাস্তবায়িত করার একটা প্রবল আগ্রহের সৃষ্টি হতে পারে যা বর্তমান সামাজিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলতে চাইবে। এইভাবে মার্কিউস ফয়েডীয় মনস্তত্ত্বকে গণমনস্তত্ত্বে রূপান্তরিত করে তার মধ্যে একটা 'রাজনৈতিক এবং সামাজিক অর্থ' আরোপ করতে চেয়েছেন। তাঁর হাতে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের মূল ধারণাগুলি রাজনৈতিক ধারণায় রূপান্তরিত হয়েছে।

অনেকেই মনে করেন 'Eros and Civilization'-এ মার্কিউসের বক্তব্যের সঙ্গে তাঁর আগের বই 'One Dimensional Man'-এর বক্তব্যের মধ্যে অনেক বিরোধ রয়েছে। প্রথম গ্রন্থে মনে হয় মার্কিউস বলতে চেয়েছেন যে মুক্তির অন্যতম পূর্বশর্ত হল প্রয়োগিক যুক্তিবাদিতার এক অতি উচ্চ স্তর। কিন্তু দ্বিতীয় গ্রন্থে উৎপাদন শক্তির এই উন্নয়নের মধ্যেই সম্ভাব্য বিপ্লবের পশ্চাদপসরন লক্ষ করছেন। এই আশা-নিরাশার দোলাচলের মধ্যে তাঁর 'রাজনীতির ধারণা' অস্পষ্টই থেকে যাচ্ছে।

একটু অন্যভাবে দেখলে সমস্যাটি এই রকম দাঁড়ায়। আমরা কি সত্যিই কৃৎকৌশলকে তার রাজনৈতিক ব্যবহারের সম্ভাবনা থেকে আলাদা করতে পারি? আর যদিই বা সেই সীমারেখা টানা আদৌ সম্ভব হয় তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায় যে সেই কৃৎকৌশলের প্রকৃতিই বা কী আর তার সামাজিক ব্যবহারের ধরনই বা কী? সমস্যাটি জটিল এবং এর সমাধান এখনও আমাদের আয়ত্ত্বাধীন নয়। কারণ, টেকনোলজি একই সঙ্গে রাজনীতির হাতিয়ার এবং তার প্রতিযোগী। আজকের দিনে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে কৃৎকৌশল রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এবং বিশেষ করে রাজনৈতিক যূথবদ্ধকরণের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিন্তু কৃৎকৌশলের বিবর্তন এবং উন্নতির একটা নিজস্ব ইতিহাস, একটা নিজস্ব ধারা আছে। তা রাজনীতিবিদদের অঙ্গুলিহেলনের উপর

নির্ভরশীল নয়। বরং রাষ্ট্রপরিচালকদেরও এই সত্য মেনে নিতে হয়। কিন্তু হাতিয়ার বা প্রতিপক্ষ যেভাবেই আমরা রাজনীতি এবং কৃৎকৌশলের সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করি না কেন একথা না মেনে উপায় নেই যে উভয়পক্ষেই 'রাজনীতি'র অর্থ অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, কারণ এই রাজনীতি নৈতিক ভিত্তিভূমি থেকে উৎখাত।

এবার ক্রিটিকাল থিয়োরির চতুর্থ পর্বে আসা যাক। এই পর্বের মূল নায়ক হলেন য়ুর্গেন হাবারমাস, যিনি ক্রিটিকাল থিয়োরির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলেও অত্যন্ত সচেতনভাবে অ্যাডোর্নো এবং হর্কহাইমারের চিন্তাধারা থেকে নিজেকে বিশ্লিষ্ট করেছেন, বিশেষ করে তাঁদের শেষ দিকের লেখার নেতিবাচকতা থেকে। হাবারমাসের লেখা প্রসঙ্গে যেকথাটা বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার যে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের পুরোনো ঐতিহ্যের সঙ্গে তিনি তাৎপর্যনির্ণয়বাদ এবং ভাষাতত্ত্বের দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। হাবারমাস মনে করেন প্রয়োগকৌশলগত এবং সংযোগী ক্রিয়াকলাপের মধ্যে এক মুলগত পার্থক্য রয়েছে। প্রথমটির প্রয়োগক্ষেত্র হল প্রকৃতি এবং জড়জগৎ যা আমরা আমাদের প্রয়োজনের তাগিদে গড়েপিটে নিতে চাই। কিন্তু দ্বিতীয়টির প্রয়োগক্ষেত্র হল মানুষ—যে মানুষ কথা বলে, কাজ করে । এবং এই বচন এবং ক্রিয়া সম্পাদিত হয় পরস্পরের সম্মতিতে গড়ে ওঠা বাচনিক বা অন্যান্য সংযোগী প্রতীকের মাধ্যমে। প্রথমটির উদ্দেশ্য হল ক্ষমতার বিস্তার যা আধিপত্যের রূপ নেয়। কিন্তু দ্বিতীয়টির লক্ষ্য হল অপরকে জানা এবং বোঝা, প্রভুত্ববিস্তার নয়। ব্যবহারিক এবং তাত্ত্বিক উভয়দিক থেকেই এই পার্থক্য হাবারমাসের লেখায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে।

ব্যবহারিক দিক থেকে এই পার্থক্যের একান্ত প্রভাব লক্ষ করা যায় হাবারমাসের রাজনীতির তত্ত্বের উপর। হাবারমাস তাঁর 'পলিটিক্সে'র ধারণায় গ্রীক Polis-কে পুনরুদ্ধার করতে চান। 'পলিস'-এ আমরা দেখতে পাই যে ক্রীতদাসদের ওপর সমস্ত সামাজিক উৎপাদনের ভার চাপিয়ে দিয়ে গ্রীক নাগরিকরা রাজনীতির চর্চায় নিজেদের নিয়োজিত করতেন। এর একটা প্রায় সমান্তরাল অবস্থা আমরা এখন উন্নততর ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে পাই, যেখানে কায়িক শ্রমের অনেকটাই যন্ত্র বিশেষ করে, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র করে থাকে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে বর্তমান সমাজব্যবস্থা পুরোপুরি যুক্তিনির্ভর। বিজ্ঞান এবং কৃৎকৌশলে সমৃদ্ধ এই সমাজকে তখনই সত্যিকারের যুক্তিনির্ভর সমাজ বলা যাবে যখন সেখানে বিজ্ঞান এবং কৃৎকৌশলের প্রয়োগকে সাধারণের আওতায় আনা যাবে, যখন শ্রমিকদের স্বনির্ভরতা এবং দায়বদ্ধতা আনা সম্ভব হবে, এবং যখন সৃষ্টি হবে কর্তৃত্বমুক্ত মতামত প্রকাশের এক স্বাধীন এবং অবাধ ক্ষেত্র, যা লালন করবে জীবনের উদ্দেশ্য নির্ণয়ের মুক্ত প্রচেষ্টা। তিনি আরও বললেন ব্যবহারিক যুক্তিবাদিতা বিচ্ছিন্ন মানুষের একক সম্পদ নয়। ব্যবহারিক যুক্তিবাদিতা পরস্পর-নির্ভর এবং তার মধ্য দিয়েই একটা সামাজিক চরিত্রের আদল গড়ে ওঠে। হাবারমাসের কল্পরাজ্যের মূল বিষয়বস্তু হল এমন এক আদর্শ সামাজিক ব্যবস্থা যেখানে মানুষের স্বাভাবিক সংযোগ যে-সব কারণে বিকৃত হয় সেই সমস্ত কারণগুলির সম্পূর্ণ অপনোদনের মাধ্যমে নির্বাধ মতামত প্রকাশের একটা ক্ষেত্র গড়ে তোলা।

তত্ত্বগত দিক থেকে এই পার্থক্য তাকে সংযোগী সক্ষমতা বা মতামত বিনিময়ের সক্ষমতার দিকে নিয়ে গেছে। এর জন্য প্রথম স্তরে তিনি কোন্ কোন্ কারণে সংযোগ বিঘ্নিত হয় সেগুলি

বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে যাঁরা Text-এর 'interpretation' নিয়ে গবেষণা করেছেন তাঁরা জানেন 'বিকৃতি এবং অনুল্লেখ' কতভাবে পাঠের বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু হাবারমাস মনে করেন এগুলো ততটা প্রণালীবদ্ধ নয় যতটা আপতিক। কিন্তু বর্তমান সমাজে আমরা পাই 'systematically distorted communication'. প্রণালীবদ্ধ বিকৃতির সঠিক বিশ্লেষণ বা পাঠোদ্ধারের জন্যে ফ্রয়েড এক নতুন হারমেনিউটিকস সৃষ্টি করেছিলেন। বার্তার প্রণালীবদ্ধ বিকৃতির আদর্শ নমুনা হিসাবে তিনি স্বপ্নকে বেছে নিয়েছিলেন। স্বপ্নকে যদি টেক্সট হিসাবে ধরা যায় তাহলে বলা যেতে পারে যে, স্বপ্নের মধ্যে স্রষ্টা বা অথর ইচ্ছাকৃতভাবে তার মধ্যে অনেক বিকৃতি বা ডিসটর্শন এবং অনেক কাটছাঁট বা ওমিশান ঘটিয়েছেন, যাতে করে নিজের কাছেই স্বপ্নের অন্তর্নিহিত অর্থ ঢাকা পড়ে যায়। এইভাবে দেখলে মনোবিশ্লেষণকে এক ধরনের ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হিসাবে দেখা যায়, যা প্রণালীবদ্ধ বিকৃতি থেকে সত্যিকারের 'পাঠ'টি উদ্ধার করতে সমর্থ। হাবারমাসের সহকর্মী লোরেঞ্জার এই বিষয়টি আরও বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু এই 'পাঠ' উদ্ধারের জন্যে যেটা প্রথমেই দরকার সেটা হল, হাবারমাসের ভাষায়, ভাষাগত যোগ্যতা।

এখন এই ভাষাগত যোগ্যতা বলতে কী বোঝায় এবং তার সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক কী সেটা একটু আলোচনা করা যেতে পারে। হাবারমাসের চিন্তার পশ্চাৎপটে রয়েছে মসৃণভাবে ক্রিয়াশীল ভাষার ব্যবহার যেটা সম্ভব হতে পারে তখনই যখন তার প্রেক্ষাপটে থাকে একটা সহমত। হাবারমাস মনে করেন সমস্ত ধরনের বাচনিক ক্রিয়ার পিছনেই লুকিয়ে থাকে বিভিন্ন ধরনের বৈধতার দাবি। যেমন এক ধরনের বৈধতার দাবির বিষয়বস্তু হল বচন বা উচ্চারণের বোধগম্যতা। কিন্তু এমন হতেই পারে যে এই বৈধতার দাবিগুলি সর্বগ্রাহ্য নয়। বা সেগুলি সমস্যাসঙ্কুল। সেখানে সহমতের পশ্চাৎপট নিয়েই প্রশ্ন ওঠে। তখন আবার নতুন করে বৈধতার দাবিগুলি নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। প্রয়োজন হয় আলোচনার মাধ্যমে সেগুলিকে আবার নতুন করে ঝালিয়ে দেখার। এই ধরনের সংলাপকে সত্যিকারের অর্থবহ হতে হলে যেটা প্রথমেই নিশ্চিত করা প্রয়োজন তা হল যে যাঁরা এই সংলাপে অংশগ্রহণ করছেন তাঁরা সবাই একটা 'ideal speech situation' -এর মধ্যে রয়েছেন। অর্থাৎ সংলাপ এমন অবস্থায় হচ্ছে যেখানে আগেই এটা নিশ্চিত করা হয়েছে যে মতামতের আদান-প্রদানের মাধ্যমে যে সহমত সৃষ্টি হবে সেটা হবে যুক্তির জোরে, ক্ষমতার জোরে নয়। আর এটা তখনই সম্ভব যখন সংলাপে অংশগ্রহণকারী সবাই শুধু খাতায়-কলমে নয় বাস্তবিকপক্ষেই সমান। তাহলে এটা বলাই যেতে পারে যে আদর্শ বাচনিক অবস্থার জন্যে বা আদর্শ সংলাপের জন্যে যেটা প্রথমেই দরকার সেটা হল প্রভুত্ব-মুক্ত এক আদর্শ সমাজজীবন। আর রাজনীতির সত্যিকারের আদর্শ হওয়া উচিত এই আদর্শ সমাজব্যবস্থা সৃষ্টির পথের অন্বেষণ।